স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা ।। ১২ ডিসেম্বর - ২০১১, ২৫ অগ্রহায়ণ - ১৪১৮ ।। দাম : পাঁচ টাকা

শান্তি ফিরবে কি জঙ্গলমহলে?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭
গডকরি ঠিকই বলেছেন : রাজ্যে তৃণমূল ও সিপিএমের সঙ্গে
সমদূরত্ব রেখেই চলবে বিজেপি ❑ ৮
রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ ❑ ৯
রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরানোই যায় ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ১১
আমরা কি পৃথক সংখ্যালঘু ফৌজদারি আইন তৈরির
পথে যাচ্ছি? ❑ সন্ধ্যা জৈন ❑ ১৩
কিষেণজীর মৃত্যুতে জঙ্গলমহলে মাওবাদী দাপট কি কমবে?
❑ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ❑ ১৫
মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চলকে মুক্ত করতে না পারলে জঙ্গলমহলে
শান্তি সুদূরপরাহত ❑ বাসুদেব পাল ❑ ১৭
৪০ বছর বাদে দেখা : মুক্ত বাংলাদেশ ❑ অজিত কুমার বিশ্বাস ❑ ২০
খোলা চিঠি : চোখ রাঙানি ফেল, কিষেণজী আউট ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২৩
গায়ত্রী মন্ত্র : কি ও কেন? ❑ রবীন সেনগুপ্ত ❑ ২৪
ধর্মের ভাষা ❑ নির্মল কর ❑ ২৫
অনুকরণীয় অনুসরণীয় মা সারদা ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৬
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী কি তিস্তার পানিতে ডুবে ম'ল ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০
ফেডেরার বিশ্বসেরা, লি-হেশ ছন্নছাড়া ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১
নিয়মিত বিভাগ
এইসময় : ১০ ❑ অন্যরকম : ১৯ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ পুস্তক প্রসঙ্গ : ২৭-২৮ ❑
সমাবেশ-সমাচার : ২৯ ❑ শব্দরূপ : ৩২ ❑ চিত্রকথা : ৩৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

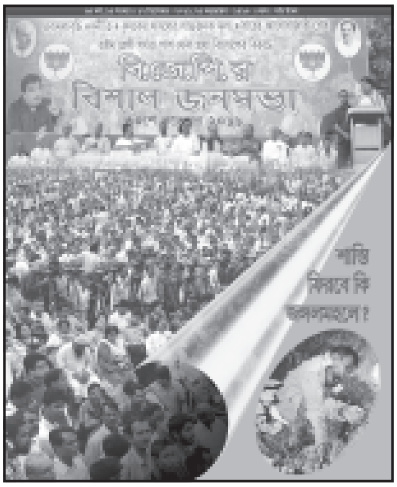

জঙ্গলমহলে মাওবাদী দাপট কি কমবে? — পৃঃ ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩, ১২ ডিসেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012
R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website :
www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

খুচরো বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ

ভারতে খুচরো ব্যবসায়ে ন্যূনতম ৫১ শতাংশ বিদেশি লগ্নির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবে কেন্দ্র— এই মর্মে দেশের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন। খুচরো বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নে দেশ জুড়িয়া তোলপাড় শুরু হইয়া যায়। সারা দেশের খুচরো ব্যবসায়ীরা বিদেশি লগ্নির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করিয়াছেন। এই প্রশ্নে মন্ত্রিসভার মধ্যেই জয়রাম রমেশ, এ কে অ্যান্টনির মতো সোনিয়া গান্ধীর ঘনিষ্ঠ নেতারাও আপত্তি তুলিয়াছেন। ইহা ছাড়া অধিকাংশ রাজ্যই খুচরো ব্যবসাকে বিদেশি পুঁজির সামনে খুলিয়া দেওয়ার বিরোধী। ইহাদের মধ্যে বাম-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি তো বটেই, এমনকী কংগ্রেস-শাসিত কেরল এবং তৃণমূল-কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গও রহিয়াছে। এখন সরকারী সিদ্ধান্ত হইল, কোনও রাজ্য না চাহিলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবে না। কেন্দ্র তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, শুধু কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বলবৎ করিবার জন্য তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও দরকার ছিল কি?

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার কারণে দেশের খুচরো বাজার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলিয়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সরকারের থাকিতেই পারে। তাই বলিয়া দেশের কোটি কোটি খুচরো ব্যবসায়ীকে বিপন্ন করিয়া এমন একটি সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিতে পারে কিনা তাহা লইয়াই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। খুচরো ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদকদের অবস্থা বিপন্ন হইতে পারে এমন আশঙ্কা কিন্তু সরকারপক্ষও উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। সরকারি সিদ্ধান্তে অবশ্য একটি শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল বহুজাতিকদের এই খুচরো দোকানে অন্তত ত্রিশ শতাংশ পণ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদকদের কাছ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাকেই সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পক্ষে রক্ষাকবচ বলিয়া দাবী করিতেছে। সরকারের এই ঘোষণায় দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। কেননা, সরকারি ঘোষণায় এমন কোনও কথা নাই যে এইসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এদেশেরই হইতে হইবে। অর্থাৎ বিদেশী পণ্য আনিয়াও এইসব বিপণিতে বিক্রি করা যাইবে। আশঙ্কার কারণ সেইখানেই। শর্তের এই ফাঁকের মধ্য দিয়া চীনের উৎপাদিত সস্তার পণ্যাদি এই দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিবে। ইহাতে দেশের শিল্প যেমন বিপন্ন হইবে তেমনই চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি যাহা এখন কুড়ি বিলিয়ন ডলার বা এক লক্ষ পাঁচ হাজার কোটি টাকা তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে।

ইহা অপেক্ষাও বেশি উদ্বেগের হইল দেশের খুচরো বাজার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া থাকা কয়েকটি ছোট ছোট খুচরো দোকানের ৯৪ থেকে ৯৬ শতাংশের উপর এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। আকারে ছোট হইলেও দেশের অর্থনীতিতে তাহাদের ভূমিকা কিন্তু একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। দেশের মোট গড় উৎপাদনের চৌদ্দ শতাংশ এই ক্ষেত্র হইতে আসিয়া থাকে। কর্মসংস্থানের সাত শতাংশও এই ক্ষেত্রই। এমন একটি ক্ষেত্রকে বিপন্ন করিয়া দেশের অর্থনীতি সবল হইতে পারিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন। বিশ্বের অনেক দেশেই কিন্তু খুচরো বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা ভাল নয়। তাহার মধ্যে রহিয়াছে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ। এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যই এখনও ওয়াল মার্টের মতো দৈত্যদের প্রবেশাধিকার দেয় নাই। ওয়াল মার্টের মতো দৈত্যরা একবার প্রবেশাধিকার পাইলে কৃত্রিম উপায়ে পণ্যের মূল্য হ্রাস করিয়া প্রথাগত খুচরো ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

ঘটনা হইল, এই ইস্যুতে কেন্দ্র সরকার এখনও তাহাদের অবস্থান স্পষ্ট করে নাই। আর এই কারণেই বিজেপি ও বামদলগুলি এখনও মুলতুবি প্রস্তাবের দাবিতে অটল। তাহাদের আশঙ্কা, সংসদের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরেই সরকার ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে পারে। সরকার কৌশলগত পশ্চাদ্‌পসারণ করিয়াছে মাত্র। ইহাকে একদিকে সরকারের মুখরক্ষা এবং অন্যদিকে বিরোধীদের কৃতিত্ব লইতে না দেওয়ার কৌশল বলা যাইতে পারে। কিন্তু গোটা ঘটনায় সরকার তথা দলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াই গেল। যাহা মেরামত করাই এখন সোনিয়া-মনমোহনের প্রথম চ্যালেঞ্জ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সর্বত্র একটা অশান্তির ভাবের উদয় হইয়াছে; সেইসঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার অভাব মোচনকারী শত শত ঔষধ বা উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। উন্নতিকামীগণের ভিতর একদলের নাম সমাজ সংস্কারক; ইঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ধ্বংস করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজসংস্কারের জন্য এই দলের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এখনও প্রাণহীন হয় নাই। ভারতের জীবন-দীপ যদি একেবারে নির্বাপিত হইয়া যাইত তাহা হইলে কি আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-সংঘর্ষের সংস্কারস্বরূপ এই সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অভ্যুদয় হইত? আবার দেখা যায়, ওই দলের ভাসা ভাসা, উপর-উপর সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনও বিচলিত নহে—তাহাতে কি ইহাই বোঝায় না যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ গভীরতা, গুরুত্ব ও সজীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান?

—ভগিনী নিবেদিতা

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাকারবার নিয়ে উদ্বেগ বি এস এফের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৪১৫৬ কিমি জুড়ে বেড়া দেওয়ার যে দীর্ঘমেয়াদী উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পটি একদা নেওয়া হয়েছিল, তারপর ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তা পুরোপুরি রূপায়ণের ন্যূনতম সম্ভাবনাটুকুও আপাতত নেই। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গবাদি পশু, ফেনসিডিল সিরাপ এবং জাল ভারতীয় নোটের চোরা-কারবার চলছে রমরমিয়ে। বিশেষ করে অসম এবং মেঘালয়ের আন্তর্জাতিক সীমান্তে এই কারবার চলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বি এস এফ। বি এস এফের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অসম এবং মেঘালয়ে এবছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ অবধি ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকার ফেনসিডিল সিরাপের বোতল আটক করেছে সীমান্ত-রক্ষী বাহিনী, সেখানে সীমান্তে চোরাচালান করার মুহূর্তে আটক করা গবাদিপশুর বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এব্যাপারে এক বরিষ্ঠ বি এস এফ আধিকারিকের সাফাই— "আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান ঠেকানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিচ্ছি, যে পরিমাণ মাল আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, সামগ্রিকভাবে চোরাচালান হওয়া মালের তা ২৫ শতাংশ মাত্র। এর সবচেয়ে বড় কারণ সীমান্তের যে জায়গাগুলো পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার কথা আমরা সেখানে সম্পূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারিনি।"

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই কথা সত্যি হলে, অসম এবং মেঘালয় সংলগ্ন সীমান্ত দিয়ে অন্ততঃপক্ষে ১৫ কোটি টাকার গবাদি পশু চোরাচালান হচ্ছে বছরে।

তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের সঙ্গে মেঘালয়ের সীমান্তে ৪৪৩ কিমি জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার যে কাজ শুরু হয়েছিল তার অর্ধেকও এখনও হয়নি এবং অসমের ধুবড়িতে বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ১৪ কিমি জুড়ে বেড়া দেওয়ার কাজও অসমাপ্ত রয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ২০০১ থেকে প্রতিবছর অসম সরকার এই প্রকল্পের রূপায়ণে চূড়ান্ত সময় হিসেবে আগামী বছরের ৩১ মার্চ অবধি সময় বেঁধে দিচ্ছে। কিন্তু এই নিয়ে বার দশেক 'চূড়ান্ত সময়' ঘোষিত হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সুতরাং বর্তমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতির দায় তরুণ গগৈ-এর অসম সরকার কোনওমতেই এড়াতে পারে না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

বি এস এফের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক একটি ফরেন্সিক রিপোর্ট। যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বর্তমানে সীমান্তে যে জাল-নোটগুলো চোরাকারবারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সেগুলো ছাপা হয়েছে পাকিস্তানে। ২০১০-এ উদ্ধার হওয়া জাল নোটের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এবছরের জানুয়ারি থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অসম ও মেঘালয়ের বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্ধার হওয়া জালনোটের পরিমাণ ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন, এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সামগ্রিক জাল নোটের তুলনায় তা অতি সামান্যই। প্রসঙ্গত, অর্থনীতিবিদরা বহুদিন ধরেই জাল নোটকে এদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-র পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করে আসছিলেন। এবছর এখনও পর্যন্ত জাল নোট পাচারের দায়ে ১৯ জনকে হাতে-নাতে ধরেছে পুলিশ। এদের সিংহভাগই বাংলাদেশি নাগরিক বলে বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্টালিনের 'ঈশ্বর বিশ্বাসী' কন্যার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাশিয়ার একনায়ক জোসেফ স্টালিনের মেয়ে লানা পিটার্স (Lana Peters) ৮৫ বছর বয়সে সম্প্রতি আমেরিকায় উইসকনথিনে প্রয়াত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিটার্স শ্বেতলেনা আলিলুইভা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সংবাদে প্রকাশ পূর্বে প্রকাশিত পিটার্সের নিজের লেখা অনুযায়ী তিনি তাঁর পিতার জমানায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের অধিকার হরণের কারণেই ১৯৬৭ সালে রাশিয়া ছাড়েন। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রয়াত তৃতীয় স্বামী ভারতীয় নাগরিক ব্রজেশ সিংহের ওপর তৎকালীন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে অকালপ্রয়াত স্বামীর চিতাভস্ম ভারতে রেখেই ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেও তিনি সরাসরি নূতন দিল্লীস্থিত আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করে রাজনৈতিক আশ্রয় চান। সুইজারল্যান্ডে কিছুদিন থাকার পর তিনি আমেরিকায় পৌঁছন। সেখান থেকেই তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিকথাধর্মী, মূলতঃ তৎকালীন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশে লেখা "Twenty Letters to a friend"। রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র সম্বলিত এই বই চটজলদি 'বেস্ট সেলারে' পরিণত হয়।

লানা পিটার্স

নজর করার বিষয় হলো, ১৯৬৭ সালে আমেরিকা পৌঁছেই পিটার্স বলেছিলেন— "I have come here to seek the self expression that has been denied to me in Russia"।

এখানেই শেষ নয়, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্টালিন কন্যা সেই সময়েই কম্যুনিজমের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী সাম্যবাদের যে পাঠ তাঁকে এতাবৎ দেওয়া হয়েছিল তা সর্বাংশে ভ্রান্ত। 'Capitalist' ও 'Communist' তক্‌মার সরল শ্রেণী বিভাজন অর্থহীন কারণ মানুষ হয় ভাল মানুষ না হলে খারাপ মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মীয় ভাবনায়ও আকৃষ্ট হন ও বলেন "it was impossible to exist without God in one's heart" (হৃদয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব না করে বেঁচে থাকা যায় না)। পিটার্স তাঁর প্রকাশিত বিস্ফোরক বইটিতে জানিয়েছিলেন ২৯ বছর ধরে বজ্রকঠিন হাতে সোভিয়েত দেশ শাসন করা তাঁর বাবা ছিলেন আদতে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত এক আধা উন্মাদ।

আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী কম্যুনিজমের সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা যে কত অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষীণ তার এটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে সাম্যবাদীদের পীঠস্থান এই বাংলাতেও এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রের সঙ্গে কেন তৃণমূল : প্রশ্ন গডকড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ২০০-টির বেশি আসন জিতবে বলে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গডকরি। গত ৩০ নভেম্বর কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতা, কৃষককে উৎপাদিত শস্যের যথোচিত মূল্য না দেওয়া, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাসফেল-প্রথা তুলে দেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

৩০ নভেম্বর কলকাতায় বিপুল জনসমাবেশে ভাষণরত নীতিন গডকরি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গডকরির প্রশ্ন— এখানে বামফ্রন্টের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি এবং তাঁর দল ক্ষমতায় এসেছেন। অথচ দিল্লীতে কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি উচ্চবাচ্য করেন না কেন? এটা কি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়? টু-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে (১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা নয়ছয়) ডি এম কে-নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী এ. রাজা জেলে। কিন্তু রাজা একা নয় তার সঙ্গে আরও অনেক কংগ্রেসী রাঘব-বোয়ালরা জড়িত।

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে সমর্থন করাও দুর্নীতির সমান।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের প্রতি তাঁর আবেদন— আপনারা এবার বাম-অপশাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপি-কে সমর্থন করুন। কেননা, বামেরা পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে পরাজয়ের পর আর কোনওদিনই কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবে না। তারা সবাই দিল্লীতে দুর্নীতিগ্রস্ত ও লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারী কংগ্রেসকেই সমর্থন করতে বাধ্য থাকবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের গরীব কৃষক, শ্রমিক, বেকারদের কল্যাণে দেশকে পরিচালনা করতে চায়। তার উদাহরণ বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কাজ।

তিনি বলেন, বিজেপি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের দল। বিজেপি মুসলমানদের বিরোধী নয়। এন ডি এ আমলে ডঃ কালামকে বিজেপি-ই রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়েছিল। সেজন্য অন্যের চশমা দিয়ে কেউ যেন বিজেপি-কে না দেখেন। বিদেশে সঞ্চিত ভারতীয়দের কালোটাকা ফেরত আনা এবং আমানতকারীদের নাম প্রকাশে কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতার কড়া সমালোচনা করেন গডকরি।

তিনি প্রশ্ন করেন, ৭০০ জনের নামের সূচী হাতে এলেও প্রকাশ করা হয়নি। তা কি অনেক কংগ্রেসীদের নাম আছে বলেই?

বস্তুত পক্ষে এদিনকার সভায় ব্যাপক জনসমাগম হয়। রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবদাস আপ্তে, সিদ্ধার্থনাথ সিংহ, চন্দন মিত্র, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিকদার, তথাগত রায়, বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, ঘনশ্যাম বেরিওয়াল, অমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাজ্য ও সর্বভারতীয় নেতারা। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

প্রভাবিত এলাকাতে কোনও উন্নয়নই করতে দেবে না মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাওবাদী নেতা কিষেণজী নিহত হলেও জঙ্গলমহলে শান্তি যে এখনও অনেক দূরে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের স্বীকারোক্তিতেই তা প্রকাশিত হয়েছে। মাওবাদীরা যে তাদের প্রভাবিত এলাকায় কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজ হতে দেবে না, গত ছয় বছরে ছত্তিশগড়সহ বিভিন্ন রাজ্যে ২৫৮টি স্কুলবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়াই তার প্রমাণ। কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন যে মাওবাদীদের এই ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম 'ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন' (ইউনেস্কো)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত বছর এই ধরনের কাজের এক বিস্তৃত রিপোর্ট সংকলন করা হয়েছে। মাওবাদীরা শুধু স্কুলগুলিই ধ্বংস করছে না, স্কুলের পড়ুয়াদের তাদের বাহিনীতে নিযুক্ত করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ স্বীকার করেছেন, পশ্চিম ঝাড়খন্ড এবং দক্ষিণ ছত্তিশগড় এখন মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল। এইসব এলাকায় সরকারের পক্ষে কোনও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করাই সম্ভব হচ্ছে না। এমনকী রেশন ব্যবস্থাও সেখানে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ছত্তিশগড়ে ১৩১টি, ঝাড়খন্ডে ৬৩টি, বিহারে ৪৬টি, ওড়িশায় ১৩টি, মহারাষ্ট্রে ৪টি এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ১টি স্কুল গত ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্দুকের সাহায্যে যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় এই মতবাদ প্রচারের জন্যই মাওবাদীরা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলেছে। এই সময়কালে মাওবাদীরা টেলিফোন টাওয়ার, ইলেকট্রিক ট্র্যান্সমিশন লাইন, পাওয়ার প্ল্যান্ট, খনি ও রেলওয়ের পরিকাঠামোসহ এমন ১,১১০টি অর্থনৈতিক প্রগতির সামগ্রীকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

গডকড়ি ঠিকই বলেছেন

রাজ্যে তৃণমূল ও সিপিএমের সঙ্গে সমদূরত্ব রেখে চলবে বিজেপি

গূঢ়পুরুষের কলম

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গডকড়ি। সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি দাবি করেছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক দল হিসাবে কমপক্ষে ২০০টি আসন পাবেই। আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে সাংবাদিকদের তাঁর দাবিটি সযত্নে লিখে রাখতেও অনুরোধ করেছেন। কলকাতার পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা সকলেই একটা কথা স্বীকার করেছেন যে ২০১৪ বা তার আগেও যদি অকাল নির্বাচন হয় তবে কংগ্রেস এবং তার জোট শরিকদের ক্ষমতায় ফেরা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে দেশজুড়ে যত উপ-নির্বাচন হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটই আগামী নির্বাচনে জিতবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নীতিন গডকরি বলেছেন, এখন যে সব আঞ্চলিক দলের নেতা বা নেত্রীরা বিজেপি-কে 'অচ্ছুৎ' বলে মনে করেন তারাই তখন বিজেপি-র 'জোট শরিক' হওয়ার জন্য লাইন দেবে।

প্রশ্ন ছিল, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এনডিএ জোটে ফিরতে চাইলে বিজেপি-র নীতি কি হবে? নীতিন গডকড়ি-র সোজা সাপ্টা উত্তর, ''আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে 'কংগ্রেস' বলেই মনে করি। অতীতে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে এনডিএ জোটে সামিল করে যে রাজনৈতিক ভুল করেছিলাম দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।'' কথাটা খাঁটি সত্য। তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলনেত্রীকে জোটের শরিক করলে কতটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয় সে শিক্ষা বিজেপি-র আছে। নেত্রীকে বিশ্বাস করে বিজেপি একদা স্বখাত সলিলে ডুবেছে। কংগ্রেসের মনমোহন সিং-সোনিয়া গান্ধীরা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন নেত্রীর উপর আস্থা রাখার পরিণাম। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি তাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের প্রতি বিজেপি-র আস্থা নেই। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী রাজনৈতিক দল তাতে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। পরিচিতি, বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুই নেই। পশ্চিমবঙ্গের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল এবং সিপিএমকে তফাতে রেখেই চলবে বিজেপি।

নীতিন গডকড়ি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সিপিএম এবং তৃণমূল দুই দলেরই বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করবে। সঠিক নীতি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একদা সিপিএমের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে প্রতারিত হয়েছিল। এখন তৃণমূল নেত্রীর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখছে। সেই আস্থা রাখার ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কোথাও তেমন কোনও উন্নয়ন চোখে পড়ছে না। বাংলার মানুষ আরও ছয় মাস হয়তো অপেক্ষা করবে। তারপর প্রতারিত মানুষ রুখে দাঁড়াবেই।

কথাটা খুবই সত্যি। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং সিপিএমের দিদি-দাদাদের লম্বা চওড়া বুলি শুনলে বাঙালির মনে হয় এরা সব মস্ত বড় দলের বিরাট মাপের নেতা নেত্রী। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এরা মোটেই তালেবর নয়। কংগ্রেস ও তার ইউপিএ জোটের নড়বড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মনমোহন-সোনিয়া-প্রণববাবুরা মমতাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছেন। মমতাও মা-মাটি-মানুষের নামে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেল করে চলেছেন। মমতাকে জোটে নিয়ে এখন ঘোর বিপাকে কংগ্রেস। সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা কংগ্রেসের। গিলতেও পারছে না। উগরে ফেলতেও পারছে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর এমন করুণ অবস্থা দেখে শিক্ষা নিয়েছে বিজেপি। তাই একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আগামী লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি অথবা বিজেপি বিরোধী যে জোটই কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসুক না কেন, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও জোটেই স্থান পাবে না। ভারতের ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলই এখন জেনে গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস সুযোগ-সন্ধানী একটি দল। বিপদের দিনে পাশে থাকবে না।

নীতিন গডকড়ি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সিপিএম এবং তৃণমূল দুই দলেরই বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করবে। সঠিক নীতি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একদা সিপিএমের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে প্রতারিত হয়েছিল। এখন তৃণমূল নেত্রীর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখছে। সেই আস্থা রাখার ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কোথাও তেমন কোনও উন্নয়ন চোখে পড়ছে না। বাংলার মানুষ আরও ছয় মাস হয়তো অপেক্ষা করবে। তারপর প্রতারিত মানুষ রুখে দাঁড়াবেই। অতীতে বামফ্রন্ট প্রতারিত করেছে। তৃণমূল সেই চেনা পথে হাঁটলে তাকেও বাংলার মানুষ আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে। তখন আঞ্চলিক দল নয়, সর্বভারতীয় দলের উপরেই আস্থা রাখবে এই রাজ্যের মানুষ। সেই দলটির নাম বিজেপি।

সংশোধনী

স্বস্তিকা ৬৪ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর ২০১১-য় ২০ পৃষ্ঠায় ''২০১৪ সালের কেরল বিধানসভা নির্বাচনে নজর রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর 'জনসংযোগ' যাত্রার নামে 'হরির লুট'' প্রতিবেদনের এই শীর্ষকটির পরিবর্তে ''২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নজর রেখেই কেরল মুখ্যমন্ত্রীর 'জনসংযোগ' যাত্রার নামে 'হরির লুট'' শীর্ষকটি পড়তে হবে। —সঃ স্বঃ।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ

নিশাকর সোম

কিষেণজী নিহত। কিন্তু কিষেণজীদের নীতি মরেনি। এই সংগ্রাম শেষ হয়নি। খবরে দেখা যাচ্ছে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়ার লোভে কিষেণজীর সহকর্মীরাই তাঁর সন্ধান পুলিশকে দিয়েছিল। এখন তো রাজনৈতিক সংগ্রামের দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলির। অপরদিকে জঙ্গলমহলে আর্থিক-সামাজিক উন্নয়নের কাজ সরকারের। আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই--- আত্মশ্লাঘা বা আত্মম্ভরিতা সর্বনাশের কারণ হবে।

কিষেণজী বলেছিলেন--- 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী চাই।' নতুন মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘ কয়েকমাস অপেক্ষা করে কিষেণজীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন।

বিপর্যস্ত অবস্থাতে সিপিএম নাজেহাল। আসলে এই পার্টির কোমর ভেঙে গেছে।

কিষেণজীর মৃত্যু নিয়ে সিপিএমের আত্মসুখের কারণ নেই। কারণ নকশালীদের হত্যায় সিপিএম হাত পাকিয়ে ফেলেছিল। তবে সেই পথে যাঁরাই হাঁটার চেষ্টা করবেন তারাও সিপিএমের মতো অবস্থায় আসবেনই। এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ভাবে সিপিএম ইউপিএ-এর বিরোধিতায় 'সংসদীয় ঐক্য' থেকে সরে যায়নি। তবে সংসদে মূলতুবী প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে সত্যিকারের বিরোধিতা আর মেকি বিরোধিতার দৃশ্য উন্মোচিত হবেই। দুঃখের কথা, ইউপিএ সরকারের জনবিরোধী নীতির সমর্থনে এখনও কোনও কোনও সংবাদপত্রে কিছু যুক্তিজাল দেখা যাচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও সংবাদপত্র নিজ বাণিজ্যিক সুবিধাকেই ইষ্টজপ করে 'নিউজ পেপার'-এর ভূমিকা ছেড়ে অন্ধ স্তাবকতার পথ নিয়েছে। আজকের রাজনৈতিক নেতারাও সাংবাদিকদের 'দাদা-দিদি' ডাকে মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁরা অনেকেই ভুলে যান— এইসব সাংবাদিক হলেন দ্রুত রঙ বদলানোর 'পলিটিক্যাল সামিলিয়ন'। ক্ষমা করবেন সাংবাদিককুল। বাংলা সংবাদপত্র জগতে সত্যেন মজুমদার থেকে বরুণ সেনগুপ্ত'র পরম্পরা আছে। 'স্বস্তিকা'ও তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। যে সাংবাদিকগণ রাজনৈতিক নেতা এবং নীতির বিরুদ্ধে নীতিহীনতার সমালোচনা করে থাকেন— তাঁরা নিজেরা কি সবসময়েই নীতিনিষ্ঠ থাকেন? এক সময়ে সাধারণ পাঠক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের কথাকে গুরুত্ব দিতেন, আজকে সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হলেও কিছু পাঠক কিছু সংবাদপত্রকে আর তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস করেন না। দুঃখের কথা 'সিপিএমের চামচা', 'দিদির পিঠ চুলকানি সমিতি' কথাটা ইদানীং সংবাদপত্র জগতে শোনা যাচ্ছে। অবশ্যই 'স্বস্তিকা' সমেত রাজ্যের কিছু সাংবাদিক তথা সংবাদপত্র বস্তুনিষ্ঠ হয়ে চলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁরাই জনগণকে পথচলার সঠিক দিশার কথা জানাতে পারবেন। আজ যদি তাঁদের কথা বেশি মানুষ গ্রহণ করতে না পারেন, তবে এইসব মানুষজন নিজ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তা দেখতে পারেন।

যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। সম্প্রতি কেষ্টপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তায় এক যুবককে বাইক-বাহিনী এসে গুলি করে হত্যা করে গেল! খবরে প্রকাশ প্রমোটারিদের লাভ-লোভের এই পরিণতি। এ-রাজ্যে প্রমোটারিকে উৎসাহ-যুগিয়েছিল সিপিএম পরিচালিত সরকার। তাইতো প্রয়াত সিপিএম মন্ত্রী-নেতা বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন— ''গভর্ণমেন্ট ফর দ্য প্রমোটার বাই দ্য প্রমোটার অফ দ্য প্রমোটার।'' তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন মন্তব্য করেছিলেন— ''বিনয়বাবু মন্ত্রিসভায় আছেন কেন? মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেই পারেন।'' এর দ্বারা প্রমোটার রাজ উল্লসিত কি হয়নি? সেই ট্রাডিশন আজও চলেছে।

কেষ্টপুরের ঘটনা সম্পর্কে খবরে প্রকাশ এটি বর্তমান শাসকদলের সমর্থক প্রমোটারদের লাভ-লোভের ফসল— তাদের ভাষায় 'পয়দার লড়াই'। সর্বজনজ্ঞাত খবর হলো রাজারহাট-গোপালপুরের (যে এলাকার মধ্যে কেষ্টপুর পড়ে) বিধায়ক হলেন রাজ্যের মন্ত্রী। তাঁকে জড়িয়েও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উঠেছে। তিনি বলেছেন যে, তিনি সবকাজ মুখ্যমন্ত্রীর গোচরীভূত করে চলেন। সাধারণ মানুষের মনের কথা হলো— এতবড় ঘটনার পর এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রীর উপস্থিতি দেখা গেল না কেন? খবরে আরও প্রকাশ, এই বিধায়ক মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও নাকি 'বহু অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট জমা পড়েছে।'

যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তিন দশক ধরে লালিত পোষিত হয়েছে তারা লোভ-লালসায় নিজ সৃষ্টিকর্তাকে নাশ করতে একটুও দ্বিধা করে না। এ-রাজ্যে ১৯৭১-৭২-এর প্রত্যাবর্তনের পদধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে? শান্তিপ্রিয় মানুষকে সংগঠিত হতে হবে।

সিপিএমের মতোই এ-রাজ্যের শাসক জোটের সমস্যাও তিনটি— (১) রাজনৈতিক (২) সাংগঠনিক এবং (৩) প্রশাসনিক। রাজনৈতিক সমস্যার প্রধান দুটি কাঁটা— (১) মাওবাদীদের সমস্যা। কিষেণজির মৃত্যুতে এ-কাঁটা সরল হতে পারে, কিন্তু গলা থেকে একেবারে নেমে যায়নি। এরই মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের পদত্যাগ। ব্যতিক্রম একজন— তিনি হলেন এক সময়ের সিপিএম সমর্থনে পৌরনির্বাচনের প্রার্থী, একটি সিপিএম ঘেঁষা পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক। তিনি বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর 'নিজস্ব' কাজে নিযুক্ত। (২) দ্বিতীয় কাঁটাটা হলো— তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সমস্যা। কংগ্রেস দলকে অবলুপ্ত করার কাজ তৃণমূল করে চলার সম্ভাবনা বেশি। এ কাজে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রধান ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। তিনি অধীর চৌধুরী এবং দীপা দাসমুন্সির এলাকায় সভা করে পরোক্ষে হুমকি দিয়েছেন।

উল্লেখ করা যায় যে মমতা ব্যানার্জি যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখনই তিনি অধীর চৌধুরীকে 'সমাজবিরোধী', সুব্রত মুখার্জিকে 'তরমুজ' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সোমেন মিত্র-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি না-হতে পেরেই তৃণমূল তৈরি করেন। সোমেনবাবু বর্তমানে তৃণমূলের সাংসদ এবং তস্য পত্নী বিধায়ক। জয় হোক 'ছোড়দা'র (সোমেন মিত্র)। মধ্যকলকাতার কংগ্রেসকর্মীরা দেওয়ালে লিখেছিলেন— 'ছোড়দা তুমি এগিয়ে যাও— আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' ছোড়দা এগিয়ে গেছেন, কংগ্রেস-কর্মীরা সমানে পিছিয়ে পড়ছেন। এর পেছনে কৌশলী ছোড়দার কি কোনও কৃৎকৌশল আছে? কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার জন্য তৃণমূলনেত্রীকে তোষামোদ করে চলেছেন। আবার রাজ্য-কংগ্রেসকে নিজেদের মতো করে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন।

তৃণমূল নেত্রীর সামনে সাংগঠনিক সমস্যা হলো--- নব্য তৃণমূল বনাম নব-তৃণমূলের ক্ষমতার-লাভালাভের লড়াই। তার প্রতিচ্ছবি কেষ্টপুরের ঘটনা। এখানেও দুই মন্ত্রীর আধিপত্যের লড়াই।

শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী বাল্য-বিবাহ?

মালদা জেলা সদর হাসপাতালে সম্প্রতি ৩০টি শিশুর মৃত্যু হওয়ায় প্রশাসন নড়ে চড়ে বসেছে। জেলা খাদ্য দপ্তর যদিও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, তবে হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়েছে ১০ দিনে ক্রমান্বয়ে শিশু মৃত্যুর একটিতেও চিকিৎসার কোনও গাফিলতি ছিল না। স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসন একথা বলার পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তা হলো 'বাল্য-বিবাহ'। অপরিণত 'মা' অপরিণত শিশুর জন্ম দিচ্ছে। মালদা জেলা এমনিতেই রাজ্যের দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ প্রবণ এলাকা এবং শিশুমৃত্যুর জন্য এটিই মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। দরিদ্র এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ১৩-১৪ বছরের মধ্যে কিশোরীদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশী এবং মৃত ৩০ জন শিশুর মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান সম্প্রদায়ের শিশু ছিল। প্রশ্ন উঠছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের জননী সুরক্ষা যোজনাসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচীর কাজ তাহলে অবহেলা করা হচ্ছে কেন? অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসে মাসে মাইনে দিয়ে কেন বাল্যবিবাহ রোধ বা মায়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? অতিরিক্ত জেলা শাসক যেখানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচীর নেতৃত্বে রয়েছেন সেখানে গ্রামের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যাবে দশম শ্রেণিতে উঠতে উঠতেই শতকরা ২০ ভাগ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মালদা জেলায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলার এটিও একটি কারণ। সুতরাং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে চালু না করলে এবং অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে না তুলতে পারলে শিশু মৃত্যু কমানো যাবে না বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে মামলার দাবী

বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে বেআইনীভাবে গচ্ছিত কালোটাকার ভারতীয় মালিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা দায়ের করতে আর্জি জানালেন জনতা পার্টির সভাপতি ডঃ সুব্রমানিয়ান স্বামী। সম্প্রতি সিবিআই-এর অধ্যক্ষ এ.পি. সিংহের সঙ্গে এক সাক্ষাতে তিনি এই দাবী তোলেন। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের সময় 'অ্যাকশন কমিটি এগেইনস্ট কারাপশান ইন ইন্ডিয়া'র (এ সি এ সি আই) প্রধান ডঃ স্বামীর সঙ্গে আরও ছিলেন গোয়েন্দা বাহিনী (আই বি)-র ভূতপর্ব প্রধান এ কে দোভাল, হিন্দুত্ববাদী তাত্ত্বিক কে এন গোবিন্দাচার্য ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ এস. গুরুমূর্তি। এই প্রসঙ্গে সি বি আই অধ্যক্ষ বলেন, শ্রী স্বামীর আর্জি পরীক্ষা করার পর বিষটি সি বি আই-এর এক্তিয়ারভুক্ত হলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সি বি আই মুখপাত্র ধারিণী মিশ্রের বক্তব্য এবং ডঃ স্বামীর ঘোষণা অনুযায়ী সিবিআই ডঃ স্বামীর আর্জি ১৫ দিনের মধ্যে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস

এই সময়

দিয়েছেন। আশ্বাস কতদূর বিশ্বাসযোগ্য হবে সেটি সময়ই বলতে পারবে। কেননা সিবিআই-এর শাসকদল নির্ভরতা তাদের নিরপেক্ষভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বাধার সৃষ্টি করে।

তালিবানদের মাস মাইনে

সংবাদ সূত্র অনুযায়ী আফগানিস্তানে হিংসা ও নাশকতামূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে তালিবানদের মাসিক ১৫০ ডলার (প্রায় ৭৫০০ টাকা) করে দেওয়া শুরু হয়েছে। বিনিময়ে সশস্ত্র তালিবানীরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারলেও সেগুলির ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এমনটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে। ন্যাটো পরিচালিত আই এস এ এফ বাহিনীর ওপর নিয়মিত হামলা রুখতে তালিবানীদের এই পুনঃসংহতিকরণ (Reintegration) প্রক্রিয়ায় ন্যাটো কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে প্রকাশ।

ইতিমধ্যে যে সমস্ত তালিবানী বৃটিশবাহিনীর সৈন্যদের খুন করেছে তাদেরও ছাড় দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধেও কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। এমনকী, যে সমস্ত তালিবান যোদ্ধারা শিশুমৃত্যু, গলা কেটে দেওয়া, মহিলাদের ফাঁসি দেওয়ার মতো নৃশংস ঘটনা ও ব্যাপক অত্যাচারে অংশ নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই ছাড় প্রযোজ্য হবে।

বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক নেওয়া এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই চুক্তিতে সন্ত্রাসবাদীরা অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নতুন ব্যবস্থায় সামিল হবে। চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী তাদের কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার বদলে একটি প্রশ্নপত্র দেওয়ার কথা, যেখানে তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে যোগ দেওয়ার কারণ জানাতে বলা হচ্ছে। তালিবানদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে হটিয়ে সম্মানের সঙ্গে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই কৌশল— এমনটাই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। রত্নাকর কতদূর বাল্মিকী হবে সেটিই এখন দেখার।

সোনারপুরে লাভ জেহাদ

একশো ভাগ হিন্দুর বসতির মাঝেও মুসলমানী না হওয়ার অপরাধে প্রাণ গেল অঙ্কিতা মণ্ডলের। সোনারপুরে নুতনপল্লীতে অঙ্কিতা মণ্ডলের পিতৃবাড়ী, পিতা পেশায় রাজমিস্ত্রি। কোনও সময় লেবার কনট্রাক্টর। মুসলমান মিস্ত্রিদের আনাগোনা বাড়িতে কেননা সস্তায় কাজ করানো যায়। ফায়দা বেশি। অঙ্কিতা মণ্ডল প্রেম-জেহাদের (লাভ জেহাদ) শিকার হলো। আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় অস্বীকার করাতে অঙ্কিতা বিয়ের চার বছর পরে নিজের বাড়ীতে ছুরি ও গুলির আঘাতে খুন হলো। প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতিক্রিয়া পরিবারটি খারাপ। সোনারপুরে অন্য আরেকটি ঘটনায় মেয়ে পাচারকারিদের হাতে পড়ে দুটি হিন্দু মেয়ে। সেখানেও লাভ জেহাদ। হিন্দু নাম ভাড়িয়ে দুটি মেয়েকে ফাঁদে ফেলে। রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লীতে নিয়ে যায়। সোনারপুর থানা অধিকতর তৎপরতায় উড়ো জাহাজে দিল্লী উড়ে যায় এবং মেয়েটি দুটিকে উদ্ধার করে সোনারপুরে নিয়ে আসে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরানোই যায়

অমলেশ মিশ্র

রোগীর চিকিৎসা এবং তার ফল হিসাবে সুস্থতা নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন চিকিৎসক ও সেবিকাদের মানসিকতা। সাধারণত এই মানসিকতা কোনও আইন করে তৈরী করা যায় না। চিকিৎসকের পেশায় যাওয়ার মূল কারণ থাকে অর্থোপার্জন। অধিক অর্থোপার্জন। চিকিৎসার মাধ্যমে জনসেবা মূল উদ্দেশ্য থাকে না। সেবিকারাও কাজটাকে যতটা চাকুরী হিসাবে নেন, ততটা সেবা হিসাবে নেন না।

কলকাতার বি.সি. রায় শিশু হাসপাতালে রোগী শিশুর মৃত্যু নিয়ে প্রায়ই আতঙ্কজনক সংবাদ পাওয়া যায়। ইদানীংকালে বর্ধমান হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা নিয়েও যথেষ্ট সোরগোল হয়েছে।

হাসপাতালে গেলেই সব রোগী সুস্থ হয়ে যাবে এমন কথা নয়। মূল কথা সুস্থ করার ব্যবস্থাটি যথাযথ আছে কিনা! সুস্থ করার যথাযথ ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয়েছে তবু রোগীকে বাঁচানো যায়নি— এমন অবস্থা কম নয়, অস্বাভাবিকও নয়। তাহলে বড় বড় এবং নামকরা নার্সিংহোমে তো সব রোগীরই সুস্থ হওয়ায় কথা— কিন্তু হয় তো না।

রোগী সুস্থ হওয়ার আশা নিয়ে হাসপাতালে বা কোন চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই জায়গায় যদি দেখা যায় অব্যবস্থার এবং অবহেলার কারণে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি— ঘোরতর আপত্তি তখনই ওঠে। ডাক্তারবাবু ও নার্সদের উপর হামলা, যন্ত্রপাতি ভাঙ্গচুর ইত্যাদি ঘটনা ঘটে।

সু-চিকিৎসা বা সুব্যবস্থিত চিকিৎসা পাওয়ার জন্য মূলত তিনটি শর্ত পালন করতেই হয়।

(১) চিকিৎসক ও সেবিকাদের মানসিকতা।

(২) কথিত চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সহ সামগ্রিক পরিকাঠামো ও পরিবেশ।

(৩) রোগীর সংখ্যার সঙ্গে চিকিৎসক ও সেবিকার সংখ্যার অনুপাত।

এই রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন যে রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে। এই সূত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হলো— সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকার সংখ্যা এই ৭০ শতাংশ মানুষের সঙ্গে সমানুপাতিক কিনা।

অর্থাৎ হাসপাতালের সংখ্যা, যন্ত্রপাতি হাসপাতাল পরিসর, চিকিৎসক এবং সেবিকা— এমন হবে যাতে ৭০ শতাংশ মানুষকে পরিষেবা দিতে পারে। কিন্তু বাস্তব চিত্র এমন নয়। এ রাজ্যের হাসপাতাল সংখ্যা, হাসপাতাল পরিসর, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, চিকিৎসক ও সেবিকা সংখ্যা রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষকে মোকাবিলা করতে পারে না। ফলে সব হাসপাতালেই রোগীর সংখ্যা, ওই হাসপাতালের সর্বোচ্চ ক্ষমতার থেকে বেশি। এই পরিস্থিতি থেকেই হাসপাতালে যাবতীয় অব্যবস্থা ও গণ্ডগোলের সূচনা হয়ে থাকে।

(১) রোগীর চিকিৎসা এবং তার ফল হিসাবে সুস্থতা নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন চিকিৎসক ও সেবিকাদের মানসিকতা। সাধারণত এই মানসিকতা কোনও আইন করে তৈরী করা যায় না। চিকিৎসকের পেশায় যাওয়ার মূল কারণ থাকে অর্থোপার্জন। অধিক অর্থোপার্জন। চিকিৎসার মাধ্যমে জনসেবা মূল উদ্দেশ্য থাকে না। সেবিকারাও কাজটাকে যতটা চাকুরী হিসাবে নেন, ততটা সেবা হিসাবে নেন না। বস্তুত শিক্ষকতা ও চিকিৎসা পেশা অন্য সমস্ত ধরনের চাকুরী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুই ক্ষেত্রে অর্থোপার্জন মূল লক্ষ্য হলে দুটো ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়। আজ আমাদের দেশে শিক্ষা এবং চিকিৎসা সব থেকে বিপর্যস্ত। কারণ এটাই যে, যারা এই সব বিভাগে কাজ করেন তাদের মানসিকতায় মূল লক্ষ্য সেবা এবং শিক্ষাদান থাকে না।

এই দুই কাজকে এক ধরনের অধিক অর্থকরী চাকুরী বলে মনে করেন। সুনাম তৈরি করা ও রক্ষা করার জন্য যতটা বিশেষত্ব ও জ্ঞান থাকা দরকার তা অবশ্যই এদের কাছে কিন্তু এদের কাছে যারা সেবা পাওয়ার জন্য আসেন— তারা ন্যায় পান না।

একজন চিকিৎসকের একজন রোগীর জন্য যতটা সময় দেওয়া প্রয়োজন তা দেন না, একজন শিক্ষকের একজন ছাত্রের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তা দেন না। ফলে জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত অবহেলা হয়, ন্যায় করা হয় না। মানবিক ন্যায় তো হয়ই না, এমনকি যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়— সেই অনুপাতেও ন্যায় হয় না। চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যবসায়িক সম্পর্কে পরিণত হয়— মানবিক বোধটা ক্রমশ কমতে থাকে। এরজন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। মানসিক ও মানবিক প্রশিক্ষণ— যা দেওয়ার লোকও নেই, নেওয়ার লোকও নেই। যে ফাঁক তৈরি হচ্ছে তা ক্রমে বাড়ছে। তাই রোগীকেন্দ্রিক বিক্ষোভ কমার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

(২) দ্বিতীয় কথা, হাসপাতালে পরিসর এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি। একটি কল্যাণকামী সরকার যদি জনসাধারণ সম্পর্কে সত্যই দায়িত্বশীল হন তবে এ দুটো নিশ্চয় ঠিক রাখা যায়। হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব থাকে। একবার একটি যন্ত্র খারাপ হলে সেটি মেরামত করতে বা নূতন যন্ত্র আনতে অনেক সময় লাগে। ডাক্তারবাবুরা পড়েন ঝামেলায়। অথচ এর জন্য ডাক্তারবাবু বা সেবিকার কোন ত্রুটি থাকে না। এটির জন্য

বি সি রায় শিশু হাসপাতালে উদ্বিগ্ন এক পিতা (ফাইল চিত্র)।

প্রয়োজন দায়িত্বশীল করিৎকর্মা প্রশাসন। আমাদের সরকারগুলি মৌখিকভাবে যতটা জনদরদী কাজের ক্ষেত্রে এবং মানের দিক দিয়ে ততটা জনদরদী নন। দরদ পুরোটাই ভোটনিষ্ঠ। ভোটনিষ্ঠ মানবিকতা চিকিৎসা তথা হাসপাতালের ক্ষেত্রে মর্মান্তিক। ঘটেও সব মর্মান্তিক ঘটনা।

(৩) তৃতীয়ত, রোগী সংখ্যা একজন চিকিৎসক একজন সেবিকা এবং প্রচলিত অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত পরিকাঠামোতে যতজন রোগীকে সামলাতে পারা সম্ভব তার থেকে বেশি রোগী থাকে। হাসপাতাল সংখ্যা কম হওয়ায় এই ঘটনা ঘটে। তা ছাড়াও ঠিক সময়ে রোগীকে হাসপাতালস্থ করাও হয় না। আমরা শুরুতেই বলেছি যে হাসপাতাল সংখ্যা, রোগী সংখ্যার সঙ্গে আনুপাতিক নয়। ভাল হাসপাতাল বলে আমরা যেগুলিকে ধরে নিই সেগুলির সংখ্যা আরও কম।

কলকাতার বড় হাসপাতালগুলিতে কলকাতার লোকে ঠাসা এবং জেলাগুলি থেকে পাঠানো রোগীতে ঠাসা থাকে। প্রত্যেক জেলায় যেমন একটি জেলা হাসপাতাল আছে, ব্লক হাসপাতাল ইত্যাদি আছে, কলকাতায় সেই ধরনের ওয়ার্ড বা বরোভিত্তিক কোনও হাসপাতাল বা জেলাভিত্তিক কোন হাসপাতাল নেই। কলকাতায় হাসপাতাল সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিশু জন্মের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শিশু হাসপাতাল বাড়ছে না— এই রকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই। ফলে যে হাসপাতালে ১০০ জনকে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসক ও সেবিকা রাখা হয়েছে— রোগীর সংখ্যা সবসময়ই ১০০-র অনেক বেশি থাকে।

চিকিৎসক এবং সেবিকা একেই ভুগছেন যন্ত্রপাতি সহ পরিকাঠামো সমস্যায় তার উপর এই বিরাট চাপ। তাঁদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও মানবিক থাকা সম্ভব হয় না। একটা যান্ত্রিকতা তাঁদের গ্রাস করে। বিষয় হলো আমার কাছে আমার রোগীই একমাত্র রোগী কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক ও সেবিকার কাছে আমার রোগীই একমাত্র রোগী নয়। তাই আমার উদ্বেগ তাঁর উদ্বেগ নয়।

সামগ্রিক এই ডামাডোল পরিস্থিতি ও অব্যবস্থার অবসান রাজ্যের সরকার নিশ্চয় করতে পারে। কিন্তু সরকারকে সেই মানসিকতায় আপ্লুত হতে হবে। ঠোঁটের থেকে হৃদয়ের ব্যবহার করতে হবে বেশি করে।

কলকাতার জন্য চারটি অন্তত পৃথক হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো ও যন্ত্রপাতির অভাব পূরণ করতে হবে। চিকিৎসক ও সেবিকাদের সেবাপরায়ণ মনোভাব যাতে তৈরি হয়, বজায় থাকে এবং সক্রিয় থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে থাকবেন না। তাঁর একমাত্র কাজ হবে হাসপাতালে হাসপাতালে যাওয়া— কোথায় কী প্রয়োজন দেখা এবং তা পূরণ করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া। হাসপাতালের চিকিৎসক সেবিকা অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে অন্ততঃ দু'মাস অন্তর বৈঠক করা— কর্মসচেতনতা ও কর্ম তৎপরতা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।

মন্ত্রী নিজে যদি এতটাই তৎপর এবং অনন্যমনা হন হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে সর্বনিম্ন গ্রেডের কর্মীটিও তৎপর ও অনন্যমনা হবেন আশা করা যায়।

এই রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেহাল আছে এবং থাকবে। কারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা অনন্যমনা ও একনিষ্ঠ নন। তাঁরা তাঁদের আরও দশ-বিশটা কাজের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রককে একটি কাজ বলে মনে করেন। একমাত্র কাজ বলে মনে করেন না।

অতিথি কলম

সন্ধ্যা জৈন

আমরা কি পৃথক সংখ্যালঘু ফৌজদারি আইন তৈরির পথে যাচ্ছি?

আজকাল কিছু ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে, বিশেষত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের। এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে এবং মনে আশঙ্কা জাগছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রেহাই দিতে আমরা চুপিসারে পৃথক ফৌজদারি আইন প্রণয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আর এতে আড়ালে প্রভাবশালী লোকজন সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা আমাদের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভয়ংকর ক্ষতিকর এবং সমগ্র জাতি যেভাবে সমান দেওয়ানি বিধি উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগত আইনকে প্রয়োগ করেছে, তার থেকেও ক্ষতিকর এই প্রবণতা। বর্তমানে রাজনৈতিক মহল ফৌজদারি বিষয়গুলিকে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে তা জাতীয়সত্তাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

নলিনী

বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে ভয়ানক এবং তা কঠোরভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

সমগ্র অপরাধমূলক কাজ দেশে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে আছে আজমল কাসভের মামলা। সুপ্রীম কোর্ট গত ১০ অক্টোবর নিম্ন আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সাজাপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করে আইনের মর্যাদা দিয়েছে। সকলেই জানে যে, ২০০৮ সালে মুম্বাই হামলার সঙ্গে যুক্ত একমাত্র জীবিত সন্ত্রাসবাদী কাসভকে ছত্রপতি শিবাজী রেলওয়ে স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করেন অকুতোভয় কনস্টেবল তুকারাম ওম্বলে। পাকিস্তানি এই সন্ত্রাসবাদীর কার্যকলাপ ক্যামেরাবন্দী করে রাখা হয়েছে।

বিচারপতি আফতাব আলম এবং সি কে প্রসাদ বলেছেন যে, সমগ্র দেশ চাইছে এই আবেদন যেন পত্রপাঠ খারিজ করে দেওয়া হয়,— এ বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু মহামান্য আদালত এক নির্দেশে বিশেষ আর্জি পেশ করতে অনুমতি দেয় এবং তাকে বলা হয় যে, ৬ মে ২০১০ সালে বিশেষ আদালত যে রায় দেয় সেই রায় কেন খারিজ করা হবে তার জন্য কারণ দর্শাতে বলেছে। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, সুপ্রিম কোর্ট তাকে কোনওভাবেই রেহাই দেবে না এবং যত শীঘ্র সম্ভব তার দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হবে, কারণ তার সুরক্ষার পিছনে অনেক ব্যয় হচ্ছে।

প্রিয়াংকা

অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য আইনগত চর্চা চলছে কীভাবে সংখ্যালঘু রাজনীতিকে সামনে রেখে খুন সহ অন্যান্য দণ্ডাজ্ঞাকে লঘু করা যায়। বাস্তবিকই ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের এবং সংখ্যালঘুদের ভিতরে এক যোগসাজশ চলছে যাতে বিশেষ বিবেচনার আড়ালে সংখ্যালঘু সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের রেহাই দেওয়া যায়। এমনটা যদি সত্যিই ঘটে তবে এদেশকে ভয়াবহ অবস্থায় সম্মুখীন হতে হবে।

বর্তমানে আফজল গুরুকে নিয়েও যথেষ্ট রাজনীতি হচ্ছে। এই আফজল গুরু ১৩ ডিসেম্বর ২০০১ সালে সংসদ হামলার সঙ্গে জড়িত সাজাপ্রাপ্ত আসামী। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, মামলার শুরুতেই মানবাধিকার সংস্থার লোকজনরা ঝামেলা শুরু করেছিল। এই মানবাধিকার সংস্থার সদস্যদের আন্দোলনের জেরে নিম্ন আদালত কিছু অভিযুক্তকে মুক্তি দেয় আর কয়েকজনকে সাজা শোনায়। বিভিন্ন অপরাধীর সপক্ষে আইনি সাহায্য দেবার বিষয়ে অনেক চুলচেরা চর্চা হয়, যদিও অপরাধী ও তাদের এনজিও-দের স্বীকৃত আইনি সাহায্য পাবার অধিকার রয়েছে।

এখন সমস্ত আইনি পথ যখন বন্ধ তখন বিষয়টা ইউপিএ-ওয়ানের সভানেত্রীর দরবারে পাঠানো হয় এবং বিবেচনার আশ্বাস পাওয়ায় বিষয়টা নতুন মোড় নেয়।

বিষয়টার পালে নতুন করে হাওয়া লাগে যখন রাজীব হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন রাষ্ট্রপতি নাকচ করে দেন এবং অভিযুক্তদের সাজা লঘু করে দেবার জন্য তামিলনাড়ু জুড়ে টুইটারে আবেদন আসতে থাকে। এ নিয়ে তামিলনাড়ু বিধানসভা এক প্রস্তাবও পাশ করে।

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বিস্ময়ে প্রকাশ করেন যখন তামিলনাড়ুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা আফজল গুরুকে নিয়ে একই ধরনের প্রস্তাব পাশ করানোর কথা বলায় দেশজুড়ে যেভাবে আলোড়ন ওঠে তা নিয়ে।

আসলে এই বিষয়টা পায়রার বাসায় বিড়াল ছেড়ে দেবার মতো। ২ সেপ্টেম্বর আফজলের ক্ষমা নিয়ে বিধানসভায় এক প্রস্তাব পেশ করেন শেখ আবদুর রশিদ। ২৮ নভেম্বর বিষয়টা তালিকাভুক্ত হয়, কিন্তু বিধানসভায় হৈ-চৈ হওয়ায় তা আলোচনা ছাড়াই মুলতুবি হয়ে যায়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি যখন ঐকমত্যে পৌঁছতে দ্বিধান্বিত তখন জাতীয় প্যান্থার পার্টির বিধায়ক ভীম সিং বলেন, ‘‘ঘটনা যখন জম্মু-কাশ্মীরে ঘটেনি সুতরাং তা রাজ্যের চর্চায় বিষয়বস্তু হতে পারে না।’’ তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু বিষয়টা রাষ্ট্রপতির বিচারাধীন সুতরাং বিধানসভার আইনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে জয়ললিতা সরকার দুর্ভাগ্যবশত এক প্রস্তাব পাশ করেছে এবং তাতে বলা হয়েছে রাজীব হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুবে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হবে। আর এই প্রস্তাবই আফজল ইস্যুকে উসকে দিয়েছে।

এমনই এক দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং এরজন্য দায়ী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া নিজেই। কয়েক বছর আগে রাজীব হত্যায় অভিযুক্ত

নিহত রাজীবের কন্যা প্রিয়াংকা ভেলোর জেলে গিয়ে গোপনে সাক্ষাৎ করেন নলিনীর সঙ্গে। বিষয়টা জনসমক্ষে আসে যখন তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেন জনৈক আইনজীবী। যদিও প্রিয়াংকা বিষয়টা মেনে নেন তথাপি তিনি অস্বীকার করেন যে, এই সাক্ষাতের পিছনে নলিনীর স্বামী মুরুগানের জীবনী লেখার বিষয়ের কোনও সম্পর্ক রয়েছে। মুশকিল হলো যে, ভেলোর জেলে প্রিয়াংকার সাক্ষাতের নথি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং শোনা যায় নলিনীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ হয়েছিল ভেলোরের স্বর্ণমন্দিরে। স্বর্ণমন্দির দর্শনের ব্যাপারটা মেনে নেন প্রিয়াংকা।

নলিনীকে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন মানবিক কারণে। ব্যাপার হলো জেলে অন্তরীণকালে নলিনী এক সন্তানের জন্ম দেয় এবং তার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন একমাত্র বিচার ব্যবস্থা-ই করতে পারে, শহীদের পরিবার তা করতে পারে না।

তথাপি এ বিষয়ে গান্ধী পরিবার বদান্যতা দেখাতে পিছু হটেনি কয়েক বছর আগে। নিহত রাজীবের কন্যা প্রিয়াংকা ভেলোর জেলে গিয়ে গোপনে সাক্ষাৎ করেন নলিনীর সঙ্গে। বিষয়টা জনসমক্ষে আসে যখন তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেন জনৈক আইনজীবী। যদিও প্রিয়াংকা বিষয়টা মেনে নেন তথাপি তিনি অস্বীকার করেন যে, এই সাক্ষাতের পিছনে নলিনীর স্বামী মুরুগানের জীবনী লেখার বিষয়ের কোনও সম্পর্ক রয়েছে। মুশকিল হলো যে, ভেলোর জেলে প্রিয়াংকার সাক্ষাতের নথি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং শোনা যায় নলিনীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ হয়েছিল ভেলোরের স্বর্ণমন্দিরে। স্বর্ণমন্দির দর্শনের ব্যাপারটা মেনে নেন প্রিয়াংকা।

সেই সময়ে ধন্দ ছিল যে, রাজীব হত্যায় গান্ধী পরিবার অন্যান্য এল টি টি ই সদস্যদের ক্ষমা করবে। এল টি টি ই হলো পরিচিত খৃস্টান সন্ত্রাসবাদী দল এবং এর পিছনে রয়েছে বিদেশী মিশনারীরা এবং কিছু প্রবাসী তামিল। সোনিয়ার হস্তক্ষেপ নলিনীর ক্ষমাপ্রদর্শনের বিষয়ে এবং নলিনীর সঙ্গে প্রিয়াংকা বঢ়রার সাক্ষাৎকার অবশ্যই ধর্ম রাজনীতিকে ব্যবহার করে আইনি ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তামিল দ্রাবিড়িয়ান দলগুলির স্বাধীনতার আগে থেকেই মিশনারী গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাই বলা বাহুল্য যে, তামিল বিধানসভার ক্ষমাপ্রদর্শনের প্রস্তাব পাশ করানোটার সঙ্গে মিশনারীদের যোগসাজশের এক সাযুজ্য স্থাপন করে। এই প্রস্তাব পাশ হয় রাষ্ট্রপতি দ্বারা ক্ষমা আবেদন খারিজ হবার পরে।

এখন রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের পর সবরকম প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। তাই তামিলনাড়ু আর বিতর্ক না বাড়িয়ে পেয়ারিবালান, সান্তান ও মুরগানদের দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা উচিত। কেন্দ্র ও সুপ্রীম কোর্টের দরকার প্রস্তাব পাশের জন্য বিধানসভাকে ভর্ৎসনা করা যা আইনের শাসনকে কার্যতঃ তামাশায় পরিণত করেছে। সোনিয়া আর তাঁর পরিবারের সকলেই তিরস্কৃত হওয়া উচিত হত্যাকে রাজনীতিকদের বিষয়ে পরিণত করাকে।

দুর্ভাগ্যবশত আবদুল্লা এক আবশ্যক প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন তাঁর প্রস্তাবের ব্যাপারে এত বিতর্ক। দেশজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে টুইট করা হয়েছে এবং সুখের বিষয় যে, প্রস্তাবটা পাশ হয়নি।

পাঞ্জাবে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল খলিস্তান মুক্তিবলের সদস্য দেবিন্দার পাল সিং ভুল্লারকে বাঁচাতে কোনও প্রস্তাব বিধানসভায় আনেননি।

ভুল্লায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয় সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯৩ সালে ৯ জন পথচারীকে দিল্লীর রাইসানা রোডে গাড়ী বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যার দায়ে। তার লক্ষ্য ছিল শিখ আন্দোলনের সমালোচক মণিন্দার সিং বিট্টাকে হত্যার। বিট্টা এতে মারা যাননি তবে গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

অপকর্ম করেই ভুল্লার জার্মানিতে পালিয়ে যায় এবং ১৯৯৫ সালে দিল্লীতে ফেরত পাঠানো হয়। ২০০১ সালে ২৫ আগস্ট সে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টও তার আবেদন খারিজ করে দেয় ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬ এবং রাষ্ট্রপতিও নাকচ করে দেন তার ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন। এক্ষেত্রেও ওমর আবদুল্লা যথার্থভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, প্রকাশ সিং বাদলের ক্ষেত্রে কেন আন্দোলন হলো না। আমরা তাই ওমরের প্রশ্নকে অবজ্ঞা করতে পারি না।

এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক অভূতপূর্ব অবস্থানে— যেখানে ধর্ম ও রাজনীতি নাক গলাচ্ছে ফৌজদারি আইনে এবং বিচারব্যবস্থাও এর বিরুদ্ধে রা কাটছে না।

এই ইস্যু ভারতীয় সংবিধানকে অচল করে দিতে পারে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিষয়টি সংবিধানের মূলগত ভিত্তি। সংবিধান ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করেনি। সংবিধান কখনওই অপরাধীদের জাতধর্ম দেখে বিচার করার ব্যবস্থাকে সায় দেয়নি। শাস্তির ক্ষেত্রে কখনওই বলা হয়নি সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থার কথা।

প্রকৃত অর্থে মনে হয় নেহরুর রাজনীতি, পন্থা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কিষেণজীর মৃত্যুতে জঙ্গলমহলে মাওবাদী দাপট কি কমবে?

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

মাওবাদী নেতা কিষেণজী যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। সুচিত্রা মাহাতো সহ বেশ কয়েকজন জঙ্গী নেতা-কর্মী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। মাওবাদী সমর্থক ও কয়েকটি সংগঠন মনে করে, অন্যায়ভাবে কিষেণজীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁরা নানাভাবে প্রতিবাদ করছেন। কিষেণজীকে শহীদের সম্মানও তাঁরা দিচ্ছেন।

কিন্তু যে প্রশ্নটা বিশেষভাবে সবার মনে আসছে, সেটা হলো কিষেণজীর মৃত্যুর পর জঙ্গলমহলের নিপীড়িত অধিবাসীরা কি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন? কিষেণজী ও তার মাওবাদী সদস্যদের হাতে বেশ কয়েক বছর ধরে শত শত নিরপরাধ সাধারণ গ্রামবাসী, সিপিএম সমর্থক, অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মী, পুলিশ কর্মী ও আধা-সামরিক দলের সদস্য গুলির শিকার হয়েছেন। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ঘরের হাঁস, মুরগি, ছাগল, চাল ইত্যাদি যেমন তারা কেড়ে নিয়েছে প্রতিদিন, তেমনি ছোট দোকানদার, ভ্যান চালক, রিক্সা-অটো চালক, লরি-বাসমালিক, সরকারি চাকুরে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কনট্রাক্টার, অন্যান্য কর্মচারী সকলকে ভয় দেখিয়ে কর আদায় করেছে, বড় বড় শিল্পপতির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের 'প্রোটেকশন টাকা'ও তারা আদায় করে আসছে। সংবাদে জানা গেল কিষেণজীর ঝুলি থেকে ৮৪০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। তথ্যটি সত্য হলে, বুঝতে হবে কী ধরনের টাকা-পয়সা নিয়ে মাওবাদী দল তাদের সন্ত্রাসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকটি সংগঠন কিষেণজীকে শহীদের সম্মান দেওয়ার প্রয়াস করছেন। যে মানুষটার হাত শত শত নিরীহ মানুষের রক্তে লাল হয়ে রয়েছে, যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক নীতিকে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের দ্বারা শেষ করে মাওবাদীদের নামে এক দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করছে, তাকে দেশদ্রোহী হিসাবে আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রত্যেক অধিবাসীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তারা অস্ত্র ব্যবহার না করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে এই নীতির পরিবর্তন করার প্রয়াস করতেই পারতো। কিন্তু রাষ্ট্রের সমস্ত আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবৈধ ভাবে, অবৈধ অস্ত্র নিয়ে, নরহত্যা করেছে। মাওবাদী সংগঠনের প্রতিটি সদস্য দেশদ্রোহিতার দায়ে দোষী। শুধু কিষেণজী কেন, মাওবাদী সংগঠনের প্রতিটি সদস্য নরহত্যা, তোলাবাজের দোষেও দোষী। কিন্তু কয়েকটি সংগঠন এবিষয়ে কোনও বক্তব্য না দিয়ে প্রশ্ন করছেন— কীভাবে কিষেণজীর মৃত্যু হয়েছে কিনা, তাঁকে গ্রেপ্তার করে, উৎপীড়ন করে হত্যা করা হয়েছে, যদি গুলির লড়াই হয়ে থাকে তাহলে সুরক্ষা কর্মীদের কেউ হতাহত কেন হলো না? ইত্যাদি। কিষেণজীর মৃতদেহ দেখে তাঁরা ঘোষণা করছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে অত্যাচার করা হয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তে এমন কোনও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি। জঙ্গলমহল বন্ধ, ভারত বন্ধ ইত্যাদি ঘোষণা করা হচ্ছে। যাঁরা মাওবাদীদের এই শহীদের স্থান দিতে চাইছেন, আমার মতে তাঁরাও দেশদ্রোহী, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা উচিত। তাঁরা বলছেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এবং দল মানবাধিকারকে পদদলিত করেছে, তারা কি মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়ার অধিকারী? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠন যেভাবে সোচ্চার হয়েছেন, সেই প্রেক্ষিতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও সেখানকার মানবাধিকার সংগঠনও নিরুত্তাপ রয়েছেন। হায়দরাবাদ— সেকেন্দ্রাবাদের ট্যাঙ্ক

মাও বিপদ

- কিষেণজীর CPI (Maoist) দলের দলীয় পদমর্যাদা অনুযায়ী ৩নং পদটি চূড়ান্ত অপয়া বলে মনে হয়।
- ২০১০ সালে আজাদ বা চেরুকুরী পলিটব্যুরোর ৩নং পদাধিকারী থাকাকালীন অন্ধ্রপ্রদেশে এক বিতর্কিত পুলিশী সংঘর্ষে মারা যান।
- দলীয় ক্ষমতার বিন্যাস অনুযায়ী ৩নং থাকাকালীনই কাকতালীয়ভাবে কিষেণজীও নিহত হলেন।

নীচে কিষেণজীর সিপিআই (মাওবাদী) দলের পদাধিকার অনুযায়ী সরকার ঘোষিত মাথার দাম দেওয়া হলো—

গণপতি—সাধারণ সম্পাদক—২৪ লক্ষ টাকা
এন কেশব রাও—পদমর্যাদায় দ্বিতীয়—১৯ লক্ষ টাকা
কিষেণজী (মৃত)—পদমর্যাদায় তৃতীয়—১৯ লক্ষ টাকা
মাল্লোজুলা ভেনুগোপাল—পদ অনুল্লেখিত—১৯ লক্ষ টাকা
কাতম সুদর্শন—পদ অনুল্লেখিত—১৯ লক্ষ টাকা
প্রশান্ত বোস—পদ অনুল্লেখিত—৭ লক্ষ টাকা
মল্লরাজ্জী রেড্ডি—পদ অনুল্লেখিত—৭ লক্ষ টাকা

বাঁধ এলাকায় মৃতদেহ রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। করিমনগরেও তেমনভাবে কোনও শোকসভা ইত্যাদি করতে দেওয়া হয়নি। কারণ ওই রাজ্যে সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠন অবৈধ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভাবতে হবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার আগে, না কি একদল দেশদ্রোহী, নরহত্যাকারীদের মানবাধিকারের প্রশ্ন আগে? এই অবস্থার প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অতি অল্প সংখ্যক মানুষই আধা-সামরিক এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে রাষ্ট্রের ও দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য তাদের যৌবন-জীবন, শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে দুর্গম জঙ্গলে, বরফঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়, রণক্ষেত্রে জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। সেই কারণেই কলকাতায় বসে প্রশ্ন করা খুবই সহজ, কিষেণজীর শরীর এতগুলি গুলির আঘাতে কেন ঝাঁঝরা করে দেওয়া হলো? তাঁকে গ্রেপ্তার করেই কি হত্যা করা হলো? যখন তাঁকে চেঁচিয়ে বলা হলো, আত্মসমর্পণ কর, উত্তরে এ কে ৪৭-এর এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। তখন কি সুরক্ষাকর্মীরা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবে না কি তাঁকে অনুনয় বিনয় করবে, অস্ত্র ত্যাগ কর বলে। এঁদের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির কোনও ধারণাই নেই। সেই জন্যই এই ধরনের প্রশ্ন উঠছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন নীতি বলে— এই রকম পরিস্থিতিতে তদন্ত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিআইডি-কে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার আরও বিস্ময়— এক বামপন্থী সাংসদ পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার সংগঠনের সুরে সুর মিলিয়েছেন। আমার বিস্ময় লাগে, এঁদের কাছে রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং দেশবাসীর সুরক্ষার কোনও মূল্যই কি নেই? প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের রাজনৈতিক দলের কিছু লাভই প্রধান প্রতিপাদ্য?

শোনা যাচ্ছে, মাওবাদী বিকাশ জঙ্গলমহলের সামরিক কর্তার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এবং মাওবাদী আকাশ রাজনৈতিক কর্মধারার দায়িত্ব নেবেন। আমার বিশ্বাস, যে কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে দমন করতে বহু বছর লেগে যায় যখন তারা সাধারণ মানুষের সমর্থন হারায়। তাদের অস্ত্র আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাঁদের অর্থের যোগান বন্ধ হয়ে যায়। তখনই তারা সত্যিকারের আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চায়। তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। অসমের উলফা, নাগাল্যান্ডের এন এস সি এন, বিগত দিনের মিজোরামে সন্ত্রাস এই ভাবেই সমাপ্ত হয়েছিল। কিষেণজীর মৃত্যুতে হয়তো কিছুদিনের জন্য মাও আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়বে, কিন্তু নতুন নেতা দায়িত্ব নেওয়ার পর তার নিজের বিশ্বাস এবং ধারণা অনুযায়ী দলকে পরিচালিত করবেন। হয়তো তিনি কিষেণজীর চাইতেও কঠোর হিংসাত্মক পথ গ্রহণ করবেন, অথবা সাধারণ দরিদ্র নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমিয়ে দেবেন। তিনি কোন পথ গ্রহণ করবেন তা সময়ই বলবে। সামরিক বাহিনীতে প্রতিপক্ষের সামরিক নেতৃত্বের মানসিক ভাবধারাও বিচার করা হয়। কীভাবে অপর পক্ষ যুদ্ধ চালাবে সেটা অনেকটা অনুমান করা সম্ভব হয়। সেই জন্যই অপেক্ষা করতে হবে কে বা কারা নেতৃত্বে স্থান পান তা দেখার জন্য। তবে সিপিআই (মাওবাদী) পলিটব্যুরোতে তেমন কোনও পরিবর্তন আশা করা যায় না। অস্ত্র ত্যাগ করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরিস্থিতি এখনও আসেনি। বরং একটা বড়সড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে মাওবাদীরা রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে একটা কিষেণজী চলে গেলেও আরও দশটা কিষেণজী সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য প্রস্তুত। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সাধারণ মানুষকে সজাগ এবং সচেতন থাকতে হবে, জঙ্গলের গভীরে ছোট ছোট গ্রামগুলির মানুষ যাদের প্রশাসন সুরক্ষা দিতে অসমর্থ এবং মাওবাদী সন্ত্রাসে যারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাওবাদীদের আশ্রয়, খাদ্য এবং গোয়েন্দা তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা, জীবন ধারণের মান উন্নয়নের প্রয়াস করতে হবে। সে কাজ লালগড়, পুরুলিয়ায় বসে হবে না। জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটি বানিয়ে অঞ্চলের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি (এরিয়া ডমিনেশন) তৈরি করতে হবে। তবেই গ্রামের মানুষ প্রশাসনের উপর ভরসা করতে পারবেন, মাওবাদীরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার বর্তমানে যে নীতি গ্রহণ করেছেন, সেটা প্রণিধানযোগ্য। কারণ একদিকে মাওবাদীদের বারংবার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ কর। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মূলধারায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে রাজ্য সরকার সব দায়িত্ব নেবে। মাওবাদী নেতৃত্বকে অনুরোধ করা হচ্ছে অস্ত্র ত্যাগ করে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা সমাধান করতে অগ্রণী হোন। অন্যদিকে শত বছরের অবহেলিত অনুন্নত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের জোয়ার আনার প্রয়াস করা হচ্ছে। মাওবাদীরা সেই প্রয়াস ব্যাহত করার প্রয়াস চালাচ্ছে, কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মানুষের সমর্থন হারাবেন। সেই সমর্থন (পীপলস্ সাপোর্ট) হারালে কোনও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বেঁচে থাকতে পারে না। প্রশাসন এবং সুরক্ষা কর্মীদের উপর আস্থা যত বাড়বে, মাওবাদীদের সন্ত্রাসের চাপ থেকে অঞ্চলের অধিবাসীরা মুক্ত হতে পারবেন। তারা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করেন ভক্তিতে নয় প্রাণের ভয়ে। তাঁরা গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, মাওবাদ কিছুই বোঝেন না। বোঝেন পেটের ক্ষিধে, আর পরিবার পরিজনদের নিয়ে শান্তিতে থাকতে।

গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকজন মাওবাদী নেতা-নেত্রী আত্মসমর্পণ করে রাষ্ট্রের মূল ধারায় ফিরে আসার পদক্ষেপ নিয়েছেন। আশা করব, আগামীদিনে আরও অনেকে ওই পথ গ্রহণ করবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, কোন অবস্থাতেই কারও অধিকার নেই, অবৈধ অস্ত্র নিয়ে নরহত্যা করার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ওই হত্যাকারীদের হাত থেকে অবৈধ অস্ত্রটি ছিনিয়ে নেওয়া। তারজন্য যতটা শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন, তা রাষ্ট্রকে করতেই হবে।

মানবাধিকার রক্ষা করতে গণতন্ত্রের বিকল্প বিশ্বে কোথাও নেই। ভারতবর্ষ তার জীবন্ত উদাহরণ। আশা করব, মাওবাদীরা বুঝতে পারবেন ভারতরাষ্ট্রের স্বার্থে এই সশস্ত্র অভিযান সমাপ্ত করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পথ খুলে দিয়েছেন। ভারতের মাওবাদী অধ্যুষিত প্রত্যেকটি রাজ্য যদি এই মডেল ব্যবহার করতে সমর্থ হন, আমার বিশ্বাস মাও অধ্যুষিত প্রতিটি রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে এবং উন্নয়নের জোয়ার ওই সমস্ত অঞ্চলে শান্তি ও প্রগতি ত্বরান্বিত করবে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চলকে মুক্ত করতে না পারলে জঙ্গলমহলের শান্তি সুদূরপরাহত

বাসুদেব পাল

নকশালবাড়ি থেকে লালগড়। প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের ব্যবধান। পাত্র— প্রায় সবই বদলে গেছে। তবে, ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে পুরোমাত্রায়। সেদিন চারু মজুমদারের মৃত্যু ঘটেছিল সেফকাস্টডিতে, পুলিশই তাকে হত্যা করেছিল বলে অনুগামীদের অভিযোগ রয়েছে প্রথম থেকেই। এবার গত ২৪ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বুড়িশোলের জঙ্গলে মুখোমুখি গুলির লড়াইয়ে নবগঠিত সিপিআই (মাওইস্ট) দলের শীর্ষনেতা, পলিটব্যুরো সদস্য তথা গেরিলা বাহিনীর প্রধান মাল্লোজুল্লা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজীর মৃত্যু ঘটে।

সত্তরের দশকের নকশালবাড়ির মতোই অবস্থানগত সুবিধা এবং তার সঙ্গে ঘন জঙ্গল। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া—এই তিন জেলার লাগোয়া জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা নিশ্চয়ই মাওবাদীদের মনে ধরেছিল। লালগড়ের জঙ্গল এবং দরিদ্র জনজাতির জনবসতির ফায়দা তুলতে জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছিলেন মাওবাদীরা এবং তাদের গেরিলা আর্মির কমান্ডার ইন চীফ এবং অন্যতম পলিটব্যুরো সদস্য কোটেশ্বর রাও বা কিষেণজী। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর মেদিনীপুর শালবনী বাসরুটের ভাদুতলা ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী কলাইচন্ডীর খালের পাশে ইলেকট্রিক লাইনে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর কনভয়কে লক্ষ্য করে ডাইরেকশনাল মাইন ব্লাস্ট করানো হয়। সময়ের হেরফেরে বুদ্ধবাবুর কনভয় নিরাপদে পার হয়ে গেলেও তদানীন্তন ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ের শেষ পুলিশগাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুমড়ে মুচড়ে যায়। কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। ওইদিন রাতেই লালগড় থানার পুলিশ আই সি সন্দীপ সিংহরায়ের নেতৃত্বে প্রায় ৫০/৫৫ কিমি দূরের ছোটপেলিয়া গ্রামে জনজাতি সাঁওতাল মহিলাদের উপর নির্দয়ভাবে লাঠি চালায়। ব্যস্! রাতারাতি গঠিত হয়— পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটি। লালগড় থানায় তালা ঝুলিয়ে দেয় কমিটি। কমিটি ও কমিটির নেতারা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকেন। বস্তুতপক্ষে জনগণের কমিটি মাওবাদীদের প্রকাশ্য মঞ্চ এবং সবরকমের তথ্য ও ব্যবস্থা প্রদানের সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করতে থাকে।

শাসক বামফ্রন্ট-এর উদ্ধত, অত্যাচারী ও সরকারি যোজনার অর্থ আত্মসাৎকারী নেতা ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্যাডাররাই কিন্তু জনগণের কমিটি ও মাওবাদী গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়। এর ফলে সিপিএমের নেতা-কর্মীরা বসে যায়। মাওবাদীদের হাতে নিহত-অপহৃত হয়। কেউ কেউ মুচলেকা দিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি ছাপিয়ে বিলি করে শাসক দল থেকে দূরে সরে যায়। এসব ঘটনার উল্লেখ জরুরী, কেননা ঘটনাগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী বর্তমান অবস্থার কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে।

ভারতবর্ষে তো জঙ্গল কম নেই, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে কিষেণজীর মতো মাওবাদীদের একজন শীর্ষস্থানীয় পলিটব্যুরো সদস্য ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাকে বাদ দিয়ে এলেন কেন? শুধু আসা নয়, দীর্ঘ কয়েকবছর যাবৎ বহাল তবিয়তে থেকে সংগঠন গড়ে তুললেন। কি আশায় কিষেণজী লালগড়ের শাল জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছিলেন? প্রথমত— জঙ্গল, অনুন্নয়ন, অশিক্ষাসহ সবরকম পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মজুত তো ছিলই, উপরন্তু তিনি তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। এটা কিষেণজীর নিজেরই স্বীকারোক্তি, যা তিনি জঙ্গলের নিরাপদ ডেরায় বসে 'টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া'র (কলকাতা সংস্করণ) দুই সাংবাদিককে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন। যা সম্ভবত ২০০৯-এর এপ্রিল-এর শেষ অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে কিষেণজী দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছিলেন--- 'সি পি এম-ই তৃণমূল-বিজেপি'র সঙ্গে লড়াই করার জন্যে তাঁরই হাতে পার্টি অফিসেই ৫০০০ কার্তুজ তুলে দিয়েছিল। তারা সেদিন সিপিএম-এর পাশে না থাকলে সিপিএম নেতা ও মন্ত্রী (তৎকালীন) সুশান্ত ঘোষ বেঁচে থাকতেন না।' অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কিষেণজী ওরফে কোটেশ্বর রাও বলেছিলেন, ''পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে সিপিএম-এর নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর দমন-পীড়ন, বীরভূমের নানুর, সূচপুর এবং গড়বেতার ছোটো আঙারিয়ার গণহত্যা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা গরীব মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করি। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে মুখর হই। তারপর গরীবদের দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে জনতাকে একত্রিত করি। ২০০০ সাল পর্যন্ত কোনও সিপিএম কর্মীর গায়ে আমরা হাত দিইনি।''

এই ছিল সেদিন কিষেণজীর বিবৃতি। সম্ভবত, কলকাতার কোনও সংবাদমাধ্যমে সেটাই ছিল তার প্রথম সাক্ষাৎকার, প্রথম প্রকাশিত ছবি (পিছন থেকে গামছা ঢাকা মুখ)। ব্যাপারটা দাঁড়াল কি— কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে কিষেণজীকে প্রশাসনিক কর্তারা হয়তো ব্যবহার করেছিলেন। আর এর পুরো ফায়দাটা মাওবাদীরা নিয়েছে— জঙ্গলমহলের বাইরে হুগলী, কলকাতায় তাদের সাংগঠনিক বিস্তার হয়েছে। কোথাও নামে, কোথাও এন জি ও-র নামের আড়ালে। যেমন, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি। পরবর্তীতে যৌথবাহিনী জঙ্গলমহলে ঘাঁটি গাড়ার পরও প্রকাশ্যে মাওবাদী মুখপাত্র গৌর চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। প্রশাসনের কৃপা-দৃষ্টি ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য পুলিশ তাঁকে নিউজ চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়ে

ফেরার সময় গ্রেপ্তার করে। তিনি এখনও জেলে। আড়ি পেতে পুলিশ বেশ কয়েকজন মাওবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে রাজা সরখেল, মাওবাদী তাত্ত্বিক সুশীল রায় এবং তেলেগু দীপকের নাম উল্লেখযোগ্য। বন্দীমুক্তির জন্য অন্দোলন ও অনশনকারী দেবলীনা চক্রবর্তী এখনও সক্রিয়— মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির নামে।

লালগড়ের জঙ্গলের অবস্থানগত সুবিধা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, সাঁওতাল জনজাতি ও তথাকথিত মাহাতো কুর্মী (ক্ষত্রিয়) জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য এবং সহজেই ঝাড়খণ্ডে ঢুকে পড়ার সুবিধা— সবমিলিয়ে মাওবাদীদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল অবস্থা। এটাই কিষেণজীকে জঙ্গলমহলে ঘাঁটি গাড়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না তিনি নিজে সাংগঠনিক গতিবিধি ও তাদের জনসমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত না হতে পেরেছেন ততদিন না সংবাদমাধ্যম না গোয়েন্দা বিভাগ— কেউই তার উপস্থিতি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। এই মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই কিষেণজীর কাল হলো, বলা যেতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসের মূলে কিন্তু ‘জনগণের কমিটি’র ব্যাপক জনসমর্থন এবং সাফল্য।

২০০৮-এর নভেম্বরে গঠিত পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির দাপটে জঙ্গলমহলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে। একটা উদাহরণই যথেষ্ট। লালগড় এলাকায় ‘কমিটি’ ও মাওবাদীদের ডাকে এক বছরে ২০০ দিনের বেশি বন্ধ পালিত হয়েছে। যে কোনও ব্যক্তি মাওবাদী বা জনগণের কমিটির নামে বনধের ডাক দিলেই বনধ্। কয়েকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। লালগড় থানায় সাদা পোষাকের গোয়েন্দা চুনীলাল মাইতিকে থানা থেকে মাত্র আধ কিমি দূরে চারজন দুষ্কৃতী মোরগ-লড়াই এর মাঠে গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গোটাকয়েক গুলি করে এবং হাঁটতে হাঁটতে নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারেনি, বিশেষ চেষ্টা করেছিল বলেও শোনা যায়নি। ডাকাবুকো গোয়েন্দা চুনীবাবু বেঘোরে প্রাণ দিলেন কর্তব্য পালন করতে গিয়ে। ওই ডাকাবুকো নাম-ডাকটাই কাল হয়েছিল চুনীবাবুর। ২০০৬ সালের কালীপূজার পরবর্তী সময়ে এটা ঘটেছিল। আগের বছর রামগড়ের কাছে বাঁকীশোলের জঙ্গলে মাইন বিস্ফোরণে পাঁচজন ই এফ আর জওয়ান শহীদ হন। ইনফর্মার মারফত খবর পেয়ে পুলিশ জীপে জওয়ানরা রওনা হয়েছিলেন মাওবাদী ধরতে। আসলে মাইনের ফাঁদ পেতেই কমন ইনফর্মার মারফত খবর পাঠানো হয়েছিল। এই ঘটনার পরই সরকারি স্তরে গাড়ীর বদলে প্রথমে সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে জওয়ানদের জঙ্গলে ঢোকার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে মাইন নিরোধক গাড়ীর পিছন পিছন নিরাপত্তাবাহিনীর টহল শুরু হয়।

শশধর মাহাতো মাওবাদী স্কোয়াডে যোগ দিলেও নিয়মিত নিজগ্রাম আমলিয়াতে যাতায়াত করত। শশধর (বর্তমানে সংঘর্ষে নিহত)-এর ভাই ছত্রধর জনগণের কমিটির অবিসম্বাদিত নেতা। আমলিয়া গ্রামের জনৈক রেশন ডিলারের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিল শশধর। বীরকাঁড় গ্রামের কমরেড ছোটি মাহাতো নিমন্ত্রণকর্তাকে বলেন— “বনের পশুদেরকেই নেমন্তন্ন করা হয়েছে।” কিছুদিন বাদেই ছোটপেলিয়া গ্রামের কাছে ছোটি মাহাতোকে বন্দুকের মুখে অপহরণ করে খুন করা হয়। ছত্রধর এসময় জেলে বন্দী। ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত। বন্দী অবস্থায় ছত্রধর কমিটির নামেই এবছর বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা আসনে প্রার্থী হন। তাতেও সিপিএম-এর লাভ হয়নি। যথারীতি তৃণমূল-প্রার্থীই জয়লাভ করে। বাম-বিরোধী ভোটাররা তৃণমূলকেই ভোট দেন। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

যৌথবাহিনী মোতায়েন হওয়ার একমাস পরের ঘটনা। ততদিনে জনগণের কমিটির বকলমে জঙ্গলমহলের গ্রামের পর গ্রাম মাওবাদীদের কব্জায় চলে গেছে। মেদিনীপুর শহরও মাওবাদীদের কব্জায় যাই যাই করছে। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা থেকে কমরেডেরা পালিয়েছে শহর এলাকায়। তারই মধ্যে দু-চারজন দু-নৌকায় পা দিয়ে চলছিল। এরকম দু'জন লালগড়ের পার্শ্ববর্তী দুবরাজপুর গ্রামের কমরেড বুধা মাহাতো ও প্রাণেশ ঘোষ। দুজনের নামেই দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। সম্ভবত তারিখটা ২০০৯-এর ২৭ জুলাই। লালগড়ের কমরেড রতিলাল মাহাতোর যুবকপুত্র (সেও কমরেড)-কে দিয়ে ওদেরকে ডাকিয়ে জনগণের কমিটির ভোলাগাড়ার সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরস্পর সখ্যতাও ছিল। সেখানে যেতেই জঙ্গল থেকে কয়েকজন এসে প্রাণেশ ও বুধা মাহাতোকে ডেকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। আজও তারা ফিরে আসেনি। উভয়ের বাড়িতেই মা-বাবা, স্ত্রী, অবোধ শিশু-পুত্র-কন্যা বর্তমান। ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব হারানোর ব্যথা বুকে চেপে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা বয়ে চলেছেন তাঁরা। এদিকে মাওবাদীরা কখনই স্বীকারই করেনি যে, তারা ওদের অপহরণ করেছে বা মেরে ফেলেছে।

এটা অতু্যক্তি হবে না যে, এলাকার সিপিএম-সহ সব রাজনৈতিক দলের সব সমর্থককেই প্রত্যক্ষ মাওবাদী না হলেও নিদেনপক্ষে জনগণের কমিটিতে নাম লেখাতে হয়েছিল। যাদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ— তাদেরকে কোথাও কোথাও ব্যাপক মারধরও করা হয়েছে। জঙ্গল লাগোয়া জঙ্গলমহলের গ্রামগুলিতে গত দু’-তিন বছরে শান্তি, উন্নয়ন বলে কিছু ছিল না। যৌথবাহিনী মোতায়েনের পর দিনে যৌথবাহিনী আর রাতে মাওবাদীদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। যৌথবাহিনী স্থানীয় কমরেডদের নির্দেশে পরিচালিত হোত একথাটা বোধকরি ভুল ছিল না। এর প্রমাণ গত ২৪ নভেম্বর যৌথবাহিনীর চূড়ান্ত সাফল্য। সিপিএম ছাড়া বাকীদের মাওবাদী অথবা মাওবাদীদের সমর্থক ধরে নিয়ে সেইমতো ব্যবহার করা হোত। থানায় ডেকে ধমক দেওয়া, আটকে রাখা, মিথ্যে কেস দিয়ে দেওয়া ছিল জলভাত। এক্ষেত্রে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট প্রশাসন এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিল। মাওবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ঝাড়খণ্ড ও তৃণমূল দলের ক্যাডারদেরকে চুপ করিয়ে দিয়ে ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া। একটা সময়ে যৌথবাহিনী ও তথাকথিত বহুচর্চিত হার্মাদবাহিনী একযোগে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করেছে বলে অভিযোগ।

সিপিএম- বিরোধী একদল বামমার্গী বুদ্ধিজীবী বার বার কলকাতা থেকে গিয়ে জনগণের কমিটি তথা ছত্রধরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কমিটির মূল কেন্দ্র দলিলপুরেও গিয়েছেন।

কিষেণজীর অবর্তমানে মাওবাদীদের চাপে রাখা, অন্তঃরাজ্য-সীমান্তে কড়া নজরদারি, আত্মসমর্পণের জন্য প্যাকেজ, ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, রাজনীতির রং না দেখে দুষ্কৃতীদের দমন, লুকানো বেআইনী শস্ত্র-ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করে বিপথগামীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা— সব মিলিয়ে শান্তি বহাল করা সম্ভব। এতদিনে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন— যাদের লক্ষ্যই হলো সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল তারা কখনও আলোচনার টেবিলে আসে না। যদি আসে তা তাদের একটা কৌশলমাত্র— এজন্য মুখোশধারীরা আশেপাশে সক্রিয়। কালক্ষেপ করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ঘটনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিয়মিত ঘটে চলেছে। কিষেণজীর মৃত্যু মানে মাওবাদীরা শেষ— এরকম ভাবাটা নিতান্তই বাতুলতা। সতেরো জন পলিটব্যুরো সদস্যের মধ্যে সাতজনই সংঘর্ষে মারা পড়েছে। তবুও লড়াই থামেনি। পরিশেষে, কেন্দ্রের উচিত মাওবাদী প্রভাবিত সবকয়টি রাজ্যে একযোগে অভিযান করা। তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চলকে মুক্ত করতে না পারলে শান্তি সুদূর পরাহত।

ডায়াবিটিস মুক্ত ভারত

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র ভবিষ্যতবাণী— একবিংশ শতাব্দীতে একটি মহামারীর আবির্ভাব হতে চলেছে ভারতে। সেই মহামারীর বহর দেখার পূর্বে তার নামটা শুনলেও হার্ট-অ্যাটাক অনিবার্য। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের উদ্বেগ না বাড়িয়ে বলে ফেলা যাক সেই মহামারীর নাম হলো গিয়ে ডায়াবিটিস। বাংলা তর্জমায় মধুমেহ। রক্তে গ্লুকোজের (চিনি) মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত হলেই এই রোগটি'র প্রাদুর্ভাব। আপাত নিরীহ এই অসুখটাই কিন্তু যাবতীয় অসুখের মূল। হু'র হিসেবে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী প্রায় ৩৪.৬ কোটি মানুষ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এস আর) সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে দেশের ৬ কোটি ২৪ লক্ষ মানুষ রয়েছেন যাঁদের রক্তে মধুমেহ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। অর্থাৎ এঁরা পুরোপুরি ডায়েবেটিক পেশেন্ট নন বটে, তবে ডায়াবেটিক পেশেন্ট হতেও আর দেরি নেই। সবদিক সাবধানে বিবেচনা করে হু'র পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন ডায়াবিটিস মহামারীর আকার ধারণ করবে ভারতবর্ষে। এসব শোনা মানে আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের ধুক-পুকানি স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে। তাহলে শুনে রাখুন বিভিন্ন তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে হু'র বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, ডায়াবিটিসের পরেই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী'র অন্যতম মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে যে রোগটি তা অবশ্যই হৃদ্‌রোগজনিত।

কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে অন্য জায়গায়। রক্তে শর্করার মাত্রা আহার্য নিয়ন্ত্রণ (ডায়েট-কন্ট্রোল)-এর মাধ্যমে যদিও কিছুটা কম করা যায় কিন্তু মূলত বংশগত (হেরিডিটি) কারণেই এই রোগের সূত্রপাত। অর্থাৎ কিনা আপনার বাবা-মা কিংবা বংশের আর কারুর মধুমেহ রোগ থেকে থাকলে যতই আপনি ডায়েট-কন্ট্রোল করুন না কেন আপনারও রক্তে মধুমেহের উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা সর্বাধিক। আবার দেখুন বর্তমানে যে খাদ্য-ভেজালের যুগ পড়েছে, তার ওপরে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে পূতিগন্ধময় বিষাক্ত বাতাস এবং সর্বোপরি হাজারো কাজের মানসিক চাপ— এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের সুস্থ থাকাটাই দুষ্কর। এর ওপর আপনার রক্তে ডায়াবিটিস থাকলে তার প্রভাব হৃদ্‌যন্ত্রেও পড়তে বাধ্য। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে চলতি শতাব্দীতে ডায়াবিটিস এবং হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাজনিত মহামারী থেকে রেহাই পাবেন না ভারতবাসী?

মা-এর পর এবার ছেলে : ডায়াবিটিক খাবারের পরম্পরা অব্যাহত।

ধরেই নেওয়া যেতে পারতো যদি না ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ এবং বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের যৌথ দায়িত্বে একটি অভিনব উদ্যোগ সংঘটিত হোত। ঘটনার সূত্রপাত ১৯৯৩ সালে। ৭০০ জন গর্ভবতী মহিলাকে মধুমেহ নিয়ন্ত্রিত আহার্য (ডায়াবেটিক কন্ট্রোলড ফুড) দেওয়া হয়। কিশোর বয়সে পদার্পণরত তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে শুরু হয়েছে এবার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা, এই ডিসেম্বর থেকেই। তাদেরকেও ডায়েবেটিক খাবারে অভ্যস্ত করানো হবে এবং এদের তৃতীয় জেনারেশন অবধি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকবে। পুরো ব্যাপারটা সংঘটিত হচ্ছে পুণের কে ই এম হাসপাতালে ডায়াবিটিস ইউনিটে। নাম দেওয়া হয়েছে পুণে মাতৃত্বকালীন পুষ্টি নিরীক্ষণ (পুণে ম্যাটারনাল নিউট্রিশন স্টাডি)। গবেষকদের দাবি, এর ফলে ডায়াবিটিস এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনী সংক্রান্ত অসুস্থতার (কার্ডিও-ভ্যাসকুলার ডিজিজ) প্রকোপ অনেকটাই কমবে।

এই সঙ্গেই যে গুরুতর প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হলো 'হেরিডিটি'র চাকাকে কি কৃত্রিম উপায়ে এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব? দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন সম্ভব। যেমন সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজির অধ্যাপক ডেভিড বার্কারের কথাই ধরা যাক। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলছে, গর্ভবস্থায় মা-র মুখে কিছু না রুচলে যে শিশুটির জন্ম হয় তাকে রুগ্ন দেখা যায় এবং পরে খেয়ে-দেয়ে তার স্বাস্থ্য ফিরলেও রুগ্নাবস্থায় তার হৃদ্‌যন্ত্রে যে দৌর্বল্য দেখা যায় তা আজন্ম থাকে। ডাঃ ক্যারোলিনা ফলের অভিজ্ঞতাও তাই। এই গবেষণা কার্যের সঙ্গে আগাগোড়া জড়িত নিউট্রিশনিস্ট হিমাঙ্গী লুব্রি জানাচ্ছেন, ছ'মাস অন্তর অন্তর তাঁরা সেই ৭০০ গর্ভবতী মহিলার শিশুদের উচ্চতা, দেহের ওজন এবং চামড়ার ভাঁজের ওপর পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করছেন। পুণের কে ই এম হাসপাতাল ছাড়াও সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ারউইক মেডিকেল স্কুল এই অভূতপূর্ব গবেষণা কাজে যুক্ত হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দাবি, গর্ভাবস্থায় সঠিক পুষ্টি সন্তান-সন্ততিদের পরবর্তী জীবনে সু-স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করে। যাই হোক, ডায়াবিটিস ও হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা দূরীকরণে এহেন অভিনব উদ্যোগ-ই তো 'অন্যরকম' আর এই সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে সফল হলে তা যে 'অনন্য' রকম, মানবসমাজের পক্ষে এই হিতকর সাফল্য এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এবং কাম্যও বটে।

৪০ বছর বাদে দেখা : মুক্ত বাংলাদেশ

অজিত কুমার বিশ্বাস

চল্লিশ বছর আগে। অনেক কথা মনে পড়ছে। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর। বনগাঁ-বয়রা সীমান্ত রাস্তায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। রাত ১২টা। ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছে যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে। ভীষণ শীত। পাশেই বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পরিচালিত উদ্বাস্তু শিবির। বাংলাদেশের ৬০ হাজার উদ্বাস্তু ছিল। আমরা সেই শিবির থেকে এসে রাস্তার পাশে সৈন্যদের চা ও কফি খাওয়াচ্ছিলাম। সারা রাত ধরে সৈন্যদের দল বাংলাদেশে ঢুকছিল। জোয়ানদের চোখে মুখে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস। সেই দলের কম্যান্ডার আমাদের বলল, "Let us meet in Jessore Cantonment."

১৯৭১-এর ৮ ডিসেম্বর একটা জীপ নিয়ে পুরো ট্র্যাঙ্ক পেট্রোল ভর্তি করে যশোর রোড দিয়ে এগিয়ে চললাম সকাল ৮টায়। সঙ্গে রয়েছেন আর এস এস-এর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক ভাউরাও দেওরস এবং কলকাতার প্রচারক কেশব দীক্ষিত। ২ দিন হলো যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পাকিস্তানি বাহিনী সবকিছু ফেলে পালিয়েছে। অরক্ষিত সীমান্ত পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বেশ কিছু মাইল গেলাম। পথে 'জয় বাংলা' স্লোগানে গ্রামের লোকেরা অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের জীবকে। যশোরের পথে একটা মোড়ে এসে জীপ দাঁড়িয়ে গেল। সামনে দেখলাম রাস্তার ওপর লাইন দিয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক হাতে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। "কাদের গুলি করছে মুক্তিবাহিনী?" একজন জোয়ান বলল "এরা সব রাজাকার। পাকিস্তানি বাহিনীর বাংলাভাষী দালাল হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যায় সহযোগিতা করেছে।"

ঠিক যখন মুক্তিফৌজের সেনারা রাজাকারদের গুলি করতে প্রস্তুত তখনই একটি ভারতীয় সেনাদের জীপ এসে দাঁড়াল। জীপ থেকে কমান্ডার বেরিয়ে এসে বলল, "Stop it. Don't Kill them. Arrest them."

শাহরিয়ার কবীর

সেদিনই বুঝলাম বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সহজে হবে না। সারা বাংলায় কয়েক হাজার রাজাকার আলবদর যারা পাকিস্তানি বাহিনীর দালালি করছে। সেই সময় যদি মুক্তিবাহিনী কয়েক হাজার রাজাকার আর আলবদরদের শেষ করে দিত, তা হলে এই দালালবাহিনী নির্মূল হয়ে যেত ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যা হোত না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই পাকিস্তানি বাহিনী ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। ২ লক্ষ মা-বোন ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী সেদিন দালালদের কোনও বিচার না করে ৯০ হাজার যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই সব ঘাতকদের শেখ মুজিবও কোনও শাস্তি দেননি।

১৯৮২ সালে জিয়াউর রহমনের হত্যার পর এরশাদ ক্ষমতাসীন হয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিল সংসদে পাশ করিয়ে মৌলবাদী ইসলামপন্থী শক্তিকে বাংলাদেশে অবাধ বিচরণের আইনগত ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। সারাদেশে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠার একটা হিড়িক পড়ে যায়। ইসলামি জোশ যুবসমাজ ও ধর্মভীরু মুসলমান সম্প্রদায়কে আরও উজ্জীবিত করলো।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে পথে নেমেছে দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। এদের স্লোগান হলো— 'যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার ষড়যন্ত্র রুখতে হবে'। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ কর। সারাদেশে বিক্ষোভ করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। বিরোধী দলের নেতা খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির দাবি করছে। তাঁর এই পাকিস্তানি মানসিকতার বিরোধিতা চলছে সারা বাংলাদেশে। নেতাদের বক্তব্য খালেদার কাছে এটাই স্বাভাবিক বক্তব্য কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদা পাকিস্তানি বাহিনীর আশ্রয়ে ছিলেন। জিয়াউর রহমান তাকে নিতে লোক পাঠালেও তিনি পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে থাকারই সিদ্ধান্ত নেন।

সারা বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল সমিতি আন্দোলন করছে। কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা খালেদার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। মুজিব হত্যার পর প্রায় ১৮ বছর সামরিক বা সেনা সমর্থিত সরকারের গণতন্ত্র বধের নিরন্তর তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালের শেখ মুজিব সহ পরিবারের ১৮ জনকে হত্যা করেছে। তারপর শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য ১৪ বার হামলা করেছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট একটুর জন্য শেখ হাসিনা রক্ষা পান।

শেখ হাসিনা

জেহাদী পাকিস্তানের কব্জা থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হলো ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান ও চীন কেউ এটাকে ভালভাবে নেয়নি। শত্রু বা মিত্র দেশ আমরা বাছতে পারি কিন্তু প্রতিবেশী দেশ আমরা বদল করতে পারব না। চীন ও পাকিস্তান চায়না ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্ক গড়ে তুলুক। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান চেয়েছিলেন একটা চুক্তির মাধ্যমে জল ও সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে। পাকিস্তান ও চীন তখন চায়নি এই চুক্তি বাস্তবায়িত হোক। তাই সে কারণেই পাক এজেন্টদের সহায়তায় মুজিবকে হত্যা করে। ভারত ও বাংলাদেশকে মনে রাখতে হবে পাকিস্তান এবং চীন আজও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়

না।

শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শেখ মুজিব হত্যার দায়ে যারা বাংলাদেশ জেলে ছিল তাদের বিচার হলো। তাদের ফাঁসি দিল। বেশ ক'জন জামায়েত নেতা যারা শেখ হাসিনাকে হত্যার অপরাধে ধরা পড়েছিল। তাদেরও বিচার হলো তাড়াতাড়ি। অপরাধী সকলের ফাঁসি হলো।

ঢাকায় এখন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াত নেতা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদি ও বি এন পি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আনুষ্ঠানিক বিচার হওয়ায় অনেকটা স্বস্তি ফিরেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিবিরে। তবু এ বিচারে একাত্তরের ভয়ঙ্কর ঘাতকরা যাতে কোনও ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে তার দাবি জানাতে এখনও সারাদেশে মুক্তি যোদ্ধারা প্রতিদিনই সমাবেশ ও মানববন্ধন করছেন। মিছিল করছেন এখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন সংগঠনও তৎপর রয়েছে। বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে দাঁড়ানোয় তাঁরও বিচার দাবি করা হচ্ছে।

বিচারের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু শিহরনকারী ঘটনা সামনে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার জামায়েত নেতা হোসেন সাঈদি পিরাজপুরে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ ও শাহাজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জাফর ইকবালের বাবা তদানীন্তন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ মিজানুর রহমানকে চিঠি দিয়ে ডেকে নিয়ে দিয়ে যান। তাঁদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলি করার আগে তাঁদের 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে আদেশ করা হয়। কিন্তু তাঁরা বলেন, জয় বাংলা। এর পরই বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে তাঁদের হত্যা করা হয়। বিচারের সময় আরও জানতে পারা যায় মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই লোকটি মুদীর দোকানের কর্মচারী ছিলেন। এরও আগে রাস্তায় বসে তেল-লবণ বিক্রি করতেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেখা গেল, এই লোকটি 'ঢাকা খুলনায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ও প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। এই সাঈদি ও তার রাজাকার বাহিনী অসংখ্য হিন্দু নারীকে অপহরণ করে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেন। হিন্দুদের হত্যা করে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। ওদের মধ্যে বিপদ সাহার মেয়ে ভানু সাহাকে আটকে রেখে প্রতিদিন নিজেই ধর্ষণ করেন। ভানু কোনওভাবে পালিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। সাঈদি বহু হিন্দুকে হত্যার ভয় দেখিয়ে মুসলমান হতে বাধ্য করেছিলেন। যাঁরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার পূর্বধর্মে ফিরে গেছেন। বিচারের সময় সৈয়দ রেজাউর রহমানের বক্তব্যে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পিরোজপুরে বিভিন্ন হিন্দু পাড়ায় রাজাকার বাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে একের পর এক অভিযান, হত্যা ধর্ষণ ও লুঠপাটের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের পেশাজীবীদের এক সমাবেশে বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলে বাংলাদেশের শুধু অভিশাপমুক্ত নয় পঁচাত্তর পরবর্তী সব নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে। হাসিনা বলেন আর রাখঢাক নয়। বিরোধী দলের নেত্রীও এখন প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

গত ২-৩ বছর ধরে কয়েকটি বিচারের ফলে বাংলাদেশে একটা পরিবর্তন এসেছে। দুদেশের মধ্যে স্থায়ী সুসম্পর্কের চাবিকাঠি হলো পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদা অর্জন। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানি ও বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার দোটানা অবস্থা স্বাধীনতার প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান জেহাদী মানসিকতা ছাড়া আর কোন দিক থেকেই বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারবে না।

বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখলে বাংলাদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে যৌথ উদ্যোগে অনেক যোগাযোগ বৃদ্ধি হতে পারে। ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রয়েছে। এটা আমাদের অভিন্ন ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ফসল। দু'দেশের মানুষ বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির জন্য সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত লড়াই করেছে। দু'দেশের সম্পর্কের ভিত্তি সভ্যতা সংস্কৃতি। শিল্প, চারুকলার প্রতি প্রবল অনুরাগ দু'দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার মধ্যে গণহত্যাসহ মানবতার বিরুদ্ধে যাবতীয় নৃশংস অপরাধের মূল উৎস হলো রাজনৈতিক ইসলাম বা ধর্মের রাজনৈতিক ও জেহাদী ব্যবহার। এই মানসিকতা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১ বৈশাখ নববর্ষের উৎসব এখন সারা বাংলায় আরও ভালোভাবে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে সেইসঙ্গে ভাষা আন্দোলন স্মরণসভা। বিশ্ববিদ্যালয় কলা বিভাগের বসন্ত উৎসব সমস্ত মেয়েদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে নাচ, গান, ছবি আঁকা নাটক আদি সব দিক দিয়ে।

কুয়াকাটার পটুয়াখালির ২২ মাইল লম্বা সমুদ্র তীরে রাসপূর্ণিমা উৎসব। সম্মিলিত সংস্কৃতিক জোট শহিদ মিনারে ময়দানে নানা মেলা ও উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রামে গঞ্জে পালন করে নবান্ন উৎসব। তাতে নাচগান, আবৃত্তি আলোচনা ঢাক ঢোল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আর গরম গরম পুলি, পিঠে— দিনভর অনুষ্ঠানের মধ্যদিন একটা নতুন দেশ একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। উৎসবের মধ্য দিয়েও একটা গণতান্ত্রিক এবং সেকুলার একটা মনোভাব তৈরি করা। অগ্রহায়ণে নতুন ধান ওঠে কৃষকের মুখে ফোটে হাসি। নতুন ধানের এই আনন্দ আবহমানকাল ধরে বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয় নতুন উৎসবের বার্তা। জাত, পাত ধর্মমত নির্বিশেষে পুনর্জাগরণের একটা বার্তা শান্তি ও সমৃদ্ধির একটা ছবি সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ধরনের উৎসব দেশের মধ্যে একটা বাতাবরণ তৈরি করব।

আজ মনে পড়ছে ৪০ বছর আগের বাংলাদেশের একটি ছবি। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির তরফ থেকে আমি এবং আর এস এস প্রচারক বংশীলাল সোনী ১ মাসের জন্য শাঁখারী পট্টিতে এসেছিলাম ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সারা ভারতের মানুষের সহায়তায় আমরা বাগদার পাশে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির শিবির গড়েছিলাম। ৬০ হাজার উদ্বাস্তু ছিল সেখানে, সকলের খাওয়াদাওয়া, শিক্ষার জন্য একটি স্কুল, স্বাস্থ্যের জন্য একটি চিকিৎসাকেন্দ্র আমরা প্রায় এক বছর চালিয়েছি। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন পুরোনো প্রচারক গজানন বাপট, শিক্ষার জন্য ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শিবপ্রসাদ রায় এবং সঙ্গে হাবড়ার কয়েকজন স্বয়ংসেবক ছিলেন দেখাশুনার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলো। সব উদ্বাস্তু বাংলাদেশে ফিরে গেলেন। আমাদের হাতে তখন ছিল ১০ লক্ষ টাকা। কি ভাবে টাকাটা দিয়ে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা যায়? তাই আমি আর বংশীলাল সোনী প্রথমে গেলাম একেবারে বিধ্বস্ত হওয়া শাঁখারীপট্টিতে। সমস্ত পাড়াটা পাকিস্তানি খান সেনারা প্রায় মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এই পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে দাঁড় করাবার জন্য সকল পরিবার অনুসারে নাম লিখলাম। মোট নাম হলো প্রায় ৭০০ পরিবার। শাঁখার প্যাকেট করলাম ৭০০টি, একটি করে শাঁখের করাত। এইসব প্যাকেট একটি সভার মধ্য দিয়ে দেওয়া হলো। সভার সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস বৈদ্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৭ জন মন্ত্রী এবং ৮ জন এম পি। আজ আর নামগুলো মনে নেই। যে অনুষ্ঠান বলার জন্য এই সব খবর লিখলাম তা হলো অনুষ্ঠানের শেষে সভাস্থলে একটি রাধাকৃষ্ণ পালা পাঠ হলো। আমাদেরও খুব ভাল লাগল। বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথার তখনও কত রয়েছে। সেই সঙ্গীত গোষ্ঠি 'রাধাকৃষ্ণ' পালাকীর্তন ও খুব ভাল কীর্তন করল সেই নাটক গোষ্ঠি। সব শেষে গায়কদের সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম বলল। কিছু মুসলমান নাম। আমরা অবাক হয়ে গেলাম ৪ জন মুসলমান যুবক এই 'রাধাকৃষ্ণের কীর্তন করল।

তাই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে রয়েছে শ্রীচৈতন্য, রবীন্দ্র-নজরুল। এই শিক্ষা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। পাকিস্তানের জেহাদী মুক্ত এক নতুন সমাজ বাংলাদেশে গড়ে উঠবে।

আসুন সবাই মিলে সত্যিকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি এবং গাই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

চিঠিপত্র

স্বামী অগ্নিবেশে-এর আত্মপ্রচার

ভারতীয় সমাজে বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের নীতি-ধর্ম-সেবা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কর্ম ব্যতিরেকে, বিচিত্র ও বিবাদাস্পদ বিষয়ে জড়িয়ে প্রচারালোকের আবর্তে নিজেদেরকে মেলে ধরতে চান এরকম উল্টোপাল্টা মন্তব্য, আচরণ, গোপন চক্রান্ত সমাজের কোনও মঙ্গল সাধন তো করেই না, বরং এসব অপকর্মে ওই তথাকথিত যথোচিত সমাজ উদ্ধারকর্তা, মানবাধিকার কর্মী, তারকাদের তাতে যে কি লাভ হয় তা তাঁরাই জানেন! প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামাজিক কিল, চড়, থাপ্পড়, জুতো খাওয়া এসবও এই সব উটকো ব্যক্তিদের কাছে জলভাত হয়ে উঠেছে, উপরন্তু এই উৎকটতা প্রদর্শকবৃন্দের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ও দেশবিরোধী, ধর্মবিরোধী প্রচার, নক্কারজনক উগ্রযৌনতামূলক অনুষ্ঠানে যোগদানের বহর দিন দিন বেড়ে চলেছে। গেরুয়া বস্ত্রধারী ভণ্ড, সর্বদা গোষ্ঠী পরিবর্তনকারী, আর্যসমাজের নাম ভাঙিয়ে নিজের দুরভিসন্ধি চরিতার্থকারী স্বামী অগ্নিবেশ এই উৎকটদের শিরোমণি হয়ে বিতর্কের বহর ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছেন। মাওবাদী-কাশ্মীর পন্থী আর ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরা বিরোধী এই স্বঘোষিত 'স্বামীর' এখন একমাত্র কাজ হলো বিতর্কের মধ্যমণি হয়ে থাকা। শেষ পর্যন্ত মতিচ্ছন্ন অগ্নিবেশের সাম্প্রতিকতম কীর্তি ''বিগ বস'' ধারাবাহিকে যোগদানের ফলে বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে জোরদার।

পাদপ্রদীপের আলোয় আগত অগ্নিবেশের সারাটা জীবন যেন বিতর্কের বেড়াজালে ঘেরা। কিন্তু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্নাতক একদা এই উজ্জ্বল ছাত্রের এহেন পরিবর্তন অনেকেই আশা করেননি। কেননা নিজেকে একজন আর্য সমাজী, সন্ন্যাসী ও সংস্কারক রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। ''বিগ বস'' ধরনের কুরুচিপূর্ণ যৌন সুড়সুড়ি ও সামাজিক বেলেল্লাপনার ধারাবাহিকে যোগ দিয়ে অগ্নিবেশ কি সংস্কারের প্রত্যাশী সেটা বোঝা বেশ দুরূহ। তবে অগ্নিবেশ এটা ভালোভাবে জানেন যে, সাধারণ এক ব্যক্তির নিম্নগামিতা একটি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু একজন গেরুয়াধারী ব্যক্তির নীচতা ও উন্মার্গগামিতা ভয়ঙ্কর ভাবে সামাজিক কুপ্রভাব ফেলে। সেই সুযোগ অগ্নিবেশ ভারতীয় সন্ন্যাসী সমাজকে নিশ্চিতভাবে কলঙ্কিত করতে চান। আর এটা হয়তো ভারতীয় জীবনদর্শন ও শ্রদ্ধাবোধ নষ্টকারী কোনও আন্তর্জাতিক চক্রের আর্থিক প্রলোভনে এই ভণ্ড সন্ন্যাসী ভারতীয় সাধু সমাজের সম্মানকে ধুলোয় মেশাতে চান। নিজেকে আর্য সমাজী ঘোষণাকারী এই ব্যক্তি আর্য সভতা-সংস্কৃতি, হিন্দু-ধর্ম-পরম্পরা, সর্বত্যাগী সাধু সমাজ সব কিছুর পক্ষেই এক ভয়ঙ্কর প্রশ্নচিহ্ন রূপে প্রতীয়মান।

সম্প্রতি আন্না হাজারের ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী, অমরনাথ তীর্থযাত্রার প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যকারী, কাশ্মীরী ও মাওবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনকারী ও সর্বশেষ 'বিগবস' নামক কুরুচিপূর্ণ দূরদর্শন (টিভি) ধারাবাহিকে যোগদানকারী এই মেকী সাধুটি সর্বত্র নিজেকে আর্যসমাজী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে, আর্য সমাজের অভ্যন্তরে ভেদাভেদ নীতির প্রয়োগ এবং নানা দুর্নীতি ও নোংরামির কারণে স্বামী অগ্নিবেশকে আর্যসমাজ থেকে অনেক আগেই বহিষ্কৃত করা হয়েছে (সূত্র—আর্য সন্দেশ, ৭-১০ নভেম্বর ২০১১)। আর্য সমাজের সন্ন্যাসীরূপে অভিষিক্ত হওয়ার পর ওঁর তেজস্বী ভাষণ যেভাবে ভারতীয় আর্য-হিন্দু সমাজে উৎসাহের সঞ্চার করত, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবেশের নানা বিতর্কিত ও আর্য সমাজ বিরোধী ভেদ-নীতির প্রকাশে সেই প্রত্যাশার আগুনে ছাই চাপা পড়েছে ঢের। অগ্নিবেশের বহু পদক্ষেপ যেমন আর্য সমাজের সিদ্ধান্ত বিরোধী হয়েছে, সেগুলো সেভাবেই জনগণের সামনে প্রকাশের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ১৯৯৪ সালেই অগ্নিবেশ আর্য সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন।

গুরুকুল ইন্দ্রপ্রস্থের উপর কব্জা, সার্বদেশিক আর্যসভা কার্যালয় (দিল্লী)-তে দাদাগিরি ও জবর দখল, অসংবিধানিক ভুয়ো আর্যসভা গঠন, মহর্ষি দয়ানন্দ প্রণীত সত্যার্থ প্রকাশের পরিবর্তনের (সংশোধন) জন্য শিখ সমাজকে আশ্বাস প্রদান, হিন্দু সংগঠন সমূহের বিরুদ্ধে কুট সমালোচনা, রামজন্মভূমি, রামসেতু ও অমরনাথ যাত্রা নিয়ে সদাসর্বদা হিন্দু বিরোধী বিতর্কিত মন্তব্য, কট্টরপন্থী মুসলিম সংগঠন সমূহের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ, বেদগ্রন্থের পরিপূর্ণতায় অবিশ্বাস, সমলিঙ্গ যৌনচারের পক্ষে ওকালতি এবং ভ্রষ্টাচার বিরোধী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আন্না হাজারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এ সমস্ত অগ্নিবেশের শয়তানীর মুকুটে এক একটি শকুনের পালক (সূত্র-আর্য সন্দেশ ৭-১৩ নভেম্বর ২০১১)। এরপরও মুখোশের আড়ালের অগ্নিবেশকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, যখন সপরিবারে বসে দেখা অসম্ভব, নিকৃষ্ট রসিকতা ও যৌনতায় সুড়সুড়ি দেওয়া, নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিরোধী 'বিগবস' ধারাবাহিকে নিজের নাম লেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না স্বামী অগ্নিবেশ। সোনিয়া গান্ধী, তিস্তা শীতলবাদ, অরুন্ধতী রায়, মেধা পাটকর, প্রমুখের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অগ্নিবেশ একে একে তাদেরকেও 'বিগবস' এর জগতে নিয়ে যাবেন কিনা, যে বিষয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন উন্মার্গগামী অপসংস্কৃতি প্রেমী কীটরা। ভারতীয় বিদ্বৎজনেরা একজন প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত সমাজ নেতার এহেন পতনে দুঃখিত। অগ্নিবেশের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ যা জানতে চাইছেন তা হলো :

(১) বিরুদ্ধাচরণ ও ভ্রষ্টাচারের জন্য আর্য সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরও তিনি নিজেকে আর্য সমাজী বলে পরিচয় দেন কেন?

(২) গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে কেন তিনি চিরন্তন ভারতীয় বিশ্বাস ও হিন্দু সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চান?

(৩) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের গোপন বাসনায় কি করে, একাধারে কংগ্রেস অন্য দিকে বাম ও অতি বামপন্থীদের সঙ্গে গোপন যোগসাজস বজায় রাখেন?

(৪) হুরিয়তপন্থী ও পাকপন্থী কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে তিনি কেন আন্তর্জাতিক ভারত-বিরোধী চক্রের মদত গ্রহণ করেন?

(৫) ভারতের সর্বত্র বিচ্ছিন্নতাকামী ইসলামি জেহাদ ও খৃস্টান ধর্মান্তকরণকারী শয়তানদের বিরুদ্ধে তিনি নীরব থাকেন কেন?

হয়তো এর উত্তর এরকটাই, স্বামী অগ্নিবেশ বলেই তিনি এইসব শয়তানিগুলো করতে পারেন। ***—উপানন্দ ব্রহ্মচারী।***

চোখ রাঙানি ফেল, কিষেনজী আউট

প্রয়াত কোটেশ্বর রাও / কিষেণজী,

জানি এই চিঠি আপনি পড়তে পারবেন না। তবুও আপনাকে উদ্দেশ্য করে লিখছি। কারণ, আপনি ছাড়া এমন কাছের মাওবাদী নেতাকে আর কবে পেয়েছে আম সাংবাদিক মহল? কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনি এতটাই 'মিডিয়া ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠেছিলেন যে, মনে হচ্ছিল না আপনি কোনও নিষিদ্ধ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা। আপনার মাথার দাম ৩৫ লক্ষ টাকা। আর এই সহজলভ্যতাতেই আপনার এমন পরিণতি হলো। অস্ত্রনির্ভর নেতাদের যে এমনটাই হাল হয় তা আরও একবার প্রমাণ করে গেলেন আপনি। না, ওসামা বিন লাদেন কিংবা মুয়াম্মর গদ্দাফির সঙ্গে তুলনা করব না আপনারা কিন্তু অস্ত্রকেই ক্ষমতার উৎস মনে করার নীতির পরিণতি কেমন হয় তাঁরাও দেখিয়ে গেছেন।

বেশ কয়েকবছর আগে আপনার সঙ্গে এই পত্রলেখকের একবার দেখা হয়েছিল। কথাও অনেক হয়েছিল। আপনি এখন সে সত্যতা স্বীকার করার ঊর্ধ্বে। তখন শুনেছিলাম আপনার গোপন জীবনের কিছু কাহিনি। শুনেছিলাম কলকাতা দেখা হলেও হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন না দেখার কথা। সত্যি বলছি খুব মায়া হয়েছিল। রাজনীতির অন্ধকার পথ বেছে নিয়ে গোটা জীবন একটা অলীক স্বপ্ন দেখে গেলেন। একবার ভেবে দেখুন তো অনেক গরীব মানুষের রক্ত নিয়েও কোনও গরীব মানুষের আদৌ কোনও উপকার করতে পেরেছেন কি? বরং যাদের আশ্রয়ে থেকেছেন তাদের পদে পদে দুর্ভোগে ফেলেছেন, কিছুটা হলেও শোষণ করেছেন। নুন আনতে পান্তা ফোরানো পরিবারগুলোকে বিপথগামী করে আরও আঁধারে ঠেলে দিয়েছেন। কিছুদিন ধরেই দেখছিলাম আপনি একেবারে চুপচাপ। আপনার মোবাইল ফোনটাও আর সাড়া দিত না। এমনকি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি সেই চেয়ারে বসার পরও আপনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সঙ্গে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার অনেক নীচের স্তরের নেতা আকাশ চিঠি-চাপাটি পাঠালেও আপনি রা কাড়েননি। তখন থেকেই মনে হোত আপনি চাপে আছেন। আপনার মৃত্যুর পর যা জানলাম তাতে স্পষ্ট হলো সেই কারণটা। মাওবাদী নেতা কিষেণজী এবং স্কোয়াড নেত্রী সুচিত্রা জঙ্গলে রয়েছে। এই খবর পেয়ে ২৪ নভেম্বর দিনভর পশ্চিম মেদিনীপুরের বুড়িশোল জঙ্গলে তল্লাশি চালায় যৌথবাহিনী। মুভ করে কোবরা ফোর্স। জঙ্গলের ভিতরে শুরু হয় তীব্র লড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসে, কিষেণজী ইজ নো-মোর। এতটা সকলেরই জানা কিন্তু তারপরই প্রশ্ন উঠছে, বাহিনীর কাছে এমন পাকা খবর গেল কী করে? তবে কি দলের মধ্যেই আছে ইনফর্মার?

খবর বলছে, এই লড়াইয়ের দিন পনেরো আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলে আসেন কিষেণজী। কিছুদিন যাবৎ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা নিয়ে রাজ্য সংগঠনে যে দ্বিমত তৈরি হয়েছিল তা মেটাতেই তিনি এসেছিলেন বলে খবর। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থান স্পষ্ট করাও ছিল তাঁর লক্ষ্য। রাজ্য সম্পাদক আকাশ যেসব চিঠি বা বিবৃতি দেন তাতে সমর্থন ছিল না কেন্দ্রীয় কমিটির। আকাশের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল কিষেণজী ঘনিষ্ঠ বিকাশ কিংবা নিহত শশধর মাহাতোর স্ত্রী সুচিত্রা মাহাতোদের। শশধর মাহাতো মারা যাওয়ার পর সুচিত্রার সঙ্গে কোটেশ্বর রাওয়ের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া নিয়েও সংগঠনে প্রশ্ন ওঠে। অনেকের দাবি দু'জনের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠেছিল।

মাফ করবেন প্রয়াত কিষেণজী। এসব খবরের সত্যাসত্যের দায় আমার নয়। সবই শোনা এবং পড়া খবর। সেই সূত্রেই জেনেছি আপনার কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিল না আপনাদের কেন্দ্রীয় কমিটিও। ১৯৯৪-৯৫ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে আসলেও আপনি আড়ালেই ছিলেন। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যেই সে খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়। লালগড় কাণ্ডের সময় তো নিয়মিত সংবাদমাধ্যমকে ফোনে বিবৃতি দেওয়া শুরু করেন আপনি। সাঁকরাইল থানার অপহৃত ওসিকে মুক্তি দেওয়ার সময় তো পিছন ফিরে হলেও কোটেশ্বর রাও আপনি ক্যামেরার সামনেও চলে আসেন। এই সব আচরণকে মোটেই ভাল চোখে দেখেনি কিন্তু আপনাদের মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি। লালগড় আন্দোলনের কৌশলকে ব্যর্থতা বলেই মনে করেছেন কেন্দ্রীয় নেতা গণপতি, কেশব রাও কিংবা প্রশান্ত বোসরা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাড়খণ্ডের সারান্ডায় মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠককে ওই তিন নেতাই তো আপনার কড়া সমালোচনা করেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বেশি কথা বলার জন্য তো ভর্ৎসনাও করা হয়।

এরপরই কিষেণজী আপনি চুপ করে যান। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা নিয়ে যখন আকাশের মতো রাজ্যস্তরের নেতারা বারবার বিবৃতির লড়াই চালিয়েছেন তখন মিডিয়া ফ্রেন্ডলি কিষেণজী মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির চাপেই। এ তো গেল কেন্দ্রীয় কমিটির কথা, জঙ্গলমহলে মাওবাদী কর্মী সমর্থকদেরও যে সংগঠনের প্রতি টান ও আস্থা কমেছে সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল আপনার অবস্থানের পাকা খবর গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ায়।

তাছাড়া আপনারা যে আসলে বন্দুকের নল দেখিয়ে গরীব মানুষকেই দাবিয়ে রাখতে চান সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় জঙ্গলমহলে। রাজনৈতিক কর্মীদের মেরে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে রাখলেও আপনাদের চোখ রাঙানিতে ইদানীং কাজ হচ্ছিল না। জনভিত্তি কমছিল। ঠিক যে কারণে সিপিএমকে গোটা রাজ্যের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে সেই কারণেই কমেছে আপনাদের দাপট। বিপ্লবের নামে যে লুম্পেন বাহিনী আপনারা তৈরি করেছেন এবং তাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন সেটা সাধারণ গরীব মানুষ ভাল চোখে দেখেনি, দেখছে না। এই লুম্পেন বাহিনীর সৌজন্যে ঝাড়গ্রামে স্পঞ্জ কারখানাগুলি বহাল তবিয়তে চলেছে। এত বন্ধ ডেকেছেন কিন্তু তাতে দহিজুড়ি এলাকার বিলাসবহুল রিসর্টের ব্যবসা থেমে থাকেনি। অথচ ছোটখাটো দোকানপাটের তালা খোলা যায়নি। আপনাদের শ্রেণী সংগ্রাম যে আসলে সাধারণের ওপর অত্যাচারেরই আর এক নাম সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই সত্যিকারের জনগণই যৌথ বাহিনীকে কিষেণজীর ডেরার খবর দিয়ে মাওবাদীদের কোমর ভাঙতে চেয়েছে; তা করেছে এবং পেরেছেও। বাকি দায়িত্বট প্রশাসনের। মাননীয় কোটেশ্বর রাও আপনি যেখানেই থাকুন জেনে রাখুন, আপনাকে ধরিয়ে দেওয়া আসলে অস্ত্রের প্রতি ধিক্কার, গণতন্ত্রের বিজয়। সরকারে যে দলই থাকুক তারা আসলে গণতন্ত্রের প্রতিনিধি।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

পরম্পরা

গায়ত্রী মন্ত্র : কি ও কেন?

রবীন সেনগুপ্ত

বেদ ও তন্ত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা থেকে এ অবধি পঞ্চাশটির অধিক গায়ত্রী মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী দেবীর মন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। সেই গায়ত্রীটি এইরূপ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ।।

এছাড়া অন্য সমস্ত দেব-দেবীরই গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে, সেই মন্ত্রগুলিও এই জনপ্রিয়তম এবং বহুল ব্যবহৃত গায়ত্রী মন্ত্রটিরই সিনটেক্স ব্যবহার করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেমন ভগবান শিবের গায়ত্রীটি এইরূপ : ওঁ মহাদেবায় বিগ্রহে রুদ্রমূর্তয়ে ধীমহিঃ তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীবিষ্ণুর গায়ত্রী : ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিগ্রহে কাম সেবায় ধীমহিঃ তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশের গায়ত্রী : ওঁ তৎপুরুষায় বিগ্রহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহিঃ তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

কালিকা দেবীর গায়ত্রী : ওঁ কালিকায়ৈ বিম্নহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

কালিকা দেবীর দশমহাবিদ্যায় যে দশটি পৃথক দেবীর নাথ পাওয়া যায় তাঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক গায়ত্রী রয়েছে। নবগ্রহর জন্যও পৃথক নয়টি গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে।

ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী দেবীর জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রটির অর্থ হলো যে হে বিশ্ব প্রসবিনী মাতা, আপনি ভূ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক জুড়েই পরিব্যাপ্ত। আপনার আনন্দস্বরূপা সেই বরণযোগ্য দেবতাদের শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতির আমি ধ্যান করছি। হে পরমাত্মা, আমার মেধাকে শুদ্ধ বুদ্ধি প্রদান করুন। ধীমহি শব্দের অর্থ চিন্তন করছি, প্রচোদয়াৎ শব্দের অর্থ প্রদান করুন। ভর্গঃ শব্দের অর্থ চৈতন্য জ্যোতি।

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गोदेवस्यधीमहि
धियोयोनःप्रचोदयात्

কলিযুগে সব মন্ত্রের সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্রের শক্তি এমনিতেই অনেকগুণ হ্রাস পায়। তার উপর এক কল্পে সাবিত্রী দেবীর অভিশাপে এবং অন্য কল্পে ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সম্মিলিত শাপে গায়ত্রীর শক্তি আরও কমে যায়। পরিশেষে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্রের মাধ্যমে মন্ত্রশক্তিকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলার ব্যবস্থা হয়।

গায়ত্রী শাপোদ্ধার মন্ত্রটি এইরূপ :

ওঁ যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং পশ্যতি ধীরাঃ। সমনসো ত্বং গায়ত্রী ব্রহ্মশাপাদ বিমুক্তা ভব।। ওঁ গায়ত্রী বশিষ্ঠ শাপে বিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দো, বশিষ্ঠ দেবতা, বশিষ্ঠ শাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।। ওঁ অর্ক জ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ। শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু বিষ্ণুজ্যোতি শিবঃ পরঃ। গায়ত্রী ত্বং বশিষ্ঠ শাপাদ্বিমুক্ত ভব।। ওঁ বিশ্বামিত্র শাপ বিমোচন মন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ আদ্যা দেবতা বিশ্বমিত্র শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।। ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতী। অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে। গায়ত্রী ত্বং বিশ্বামিত্র শাপদ্বিমুক্তা ভব।।

দীর্ঘদিন ধরেই আধ্যাত্মিক মন্ত্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিরা গায়ত্রী মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ করে আসছেন সফল ভাবে। প্রায় ত্রিশটির অধিক গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যবহারিক দিকের কথা শাস্ত্র সমূহে লিপিবদ্ধ করা আছে। যেমন দুর্বা দুধ এবং ঘৃতদ্বারা টানা সাতদিন একশত গায়ত্রী মন্ত্র হোম ও ১০০ বার গায়ত্রী জপ করলে অকাল মৃত্যুকে কিছুদিনের জন্য রোধ করা যায়। গায়ত্রী মন্ত্রে প্রতিদিন ১০৮ বার ঘৃতাহুতি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে মেধা বৃদ্ধির জন্য কাতর ভাবে আবেদন করলে তাতে সুফল মেলে।

রোগ-ব্যাধির জন্য গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা বট অশ্বত্থ যজ্ঞডুমুর সমিধ দ্বারা ১০,০০০ বার হোম করলে সুফল মেলে।

রাষ্ট্রের শান্তির জন্য নিমপাতা, ঘি, লালবর্ণের চাল দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রে দশ হাজারবার হোম করে বিশেষ প্রার্থনা করতে হয়।

গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বসবার পূর্বে গায়ত্রীর ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণ করলে মনঃসংযোগের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়। ধ্যান **মন্ত্রটি এইরূপ :**

ওঁ হংসারূঢ়াং সিতাজৈস্তরুণ মনিলসদভূষাণাং ভালনেত্রাং। বেদাস্যাং মক্ষমালাংসিতমথ কমলং দন্তমাভ্যাং দধানাম্।। ধ্যায়েদোর্ভিশ্চতুর্ভিস্তি ভুবন জননী পূর্ব সন্ধ্যাভিবন্দ্যাং। গায়ত্রী মৃক সাবিত্রীমভিনব বয়সীং মণ্ডলে চণ্ড রশ্মেঃ।।

ধর্মের ভাষা

নির্মল কর

পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মীয় উদ্দীপনা, আবেগ ও দার্শনিকতা থেকেই প্রাচীন সাহিত্যসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টি সাহিত্য সংগীত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুর-তাল-লয় সমন্বিত ধর্মগীতি মানুষের স্মৃতি ও শ্রুতিতে এক কাল থেকে অন্যকাল সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতভূমের বৈদিক ও ঔপনিষদিক স্তোত্র ও গীতিগুলির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। খৃস্টধর্মেও যীশুর বন্দনাগীতির অভাব নেই। সব ধর্মেই বন্দনা গীতিগুলি দেশ-কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঋগ্বেদের স্তোত্রে যেসব চিত্রাবলী ও উপমা ব্যবহৃত, সামবেদে সেগুলি গরহাজির। আবার বাইবেলের পুরাতন ও নতুন সুসমাচারে পার্থক্য রয়েছে। গীতিগুলিতেও কালান্তরের প্রভাব স্পষ্ট। ধর্মগীতির ক্ষেত্রে কেবল কালান্তর নয়, দেশান্তরের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্যের অনেক ধর্মপ্রচারক বহুভাষী ভারতবর্ষে খৃস্টধর্ম প্রচারকালে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে খৃস্টান মিশনারিদের ভূমিকা দেখা যায়। কেরি, মার্শম্যানের ভূমিকা সুবিদিত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ গ্রন্থটিতেও খৃস্টধর্মের প্রভাব সঞ্জাত। অর্থাৎ, কোনও ধর্ম দেশান্তরে ভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করলে তাতে সেই ধর্ম-প্রচারকেরই লাভ। এর সুযোগ উনিশ শতকে এই বাংলায় খৃস্টান মিশনারীরা পুরোদস্তুর গ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত, রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন রচিত ঈশ্বরগীতিগুলির কথা আসবে। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বাস ও আচারে খৃস্টধর্মের কিছু প্রভাব বর্তমান। ব্রাহ্ম উপাসনা সংগীত পাশ্চাত্যের যিশুবন্দনাগীতির অনুরূপ। বৈষ্ণব ও শাক্তগীতির তুলনায় ব্রাহ্মসংগীত ভিন্ন প্রকার। অর্থাৎ, ভিন্ন দেশাগত ধর্মের সঙ্গে আদান-প্রদানে সংগীতের এক নবরূপ। তবে বহুক্ষেত্রে ভিন্ন দেশাগত ধর্ম স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে দেশান্তরের ভাষাকেই প্রচারমাধ্যম হিসাবে প্রয়োগ করত।

১৮৬৯ খৃস্টাব্দে চার্চ অব ইংল্যান্ডের উদ্যোগে প্রাচীন ও আধুনিক স্তোত্রগীতির যে সংকলন প্রকাশিত হয় তা খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বিশ্বে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বি বি সি কর্তৃক প্রকাশিত জনপ্রিয় বন্দনাগীতির তালিকায় কুড়িটির মধ্যে পনেরোটিই এই সংকলনভুক্ত। তথাপি ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এই প্রচলিত সংকলনটির বিরোধিতা করেছেন। বিজাতীয়রা ইংরেজি বন্দনাগীতি না গেয়ে নিজেদের ভাষায় উপাসনা সংগীত রচনা করবেন, এটাই তাঁর অভিমত। ইংরেজি ভাষার প্রচার ও প্রসারের যুগে স্থানীয় ভাষা অবহেলিত। মনে হতে পারে স্থানীয় ভাষায় যীশু-সাহিত্য রচনার প্রস্তাব দিয়ে এই অবস্থারই যেন কিঞ্চিৎ বিরোধিতা করা হলো। অবশ্য কেউ ভাবতেই পারেন, এতে গভীরতর কৌশল নিহিত। আঞ্চলিক ভাষায় যিশুগীতি রচনা করে স্থানীয় মানুষেরা তা পরিবেশন করলে খৃস্টধর্ম অনেক বেশি আত্মস্থ ও আপন হবে। খৃস্টধর্মের প্রচারকেরাই কোনও-না-কোনও পর্বে এই কৌশল গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব মানুষকে আকর্ষণ করবার জন্য কঠিন সংস্কৃতে তাঁর বাণী প্রচার করেননি, তৎকালীন লোকপ্রিয় ভাষায় করেছিলেন। তারপর ইংরেজির পরিবর্তে বিজাতীয়দের নিজ ভাষায় ধর্মসংগীত রচনার পরামর্শকে এই পরম্পরার অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

অনুকরণীয় অনুসরণীয় মা সারদা

ইন্দিরা রায়

সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের সমন্বয়ে। তার মধ্যে পুরুষ-নারীর অস্তিত্ব নিয়েই সমাজ। তবে তাদের প্রথম পরিচয় 'মানুষ'। নারীর মধ্যে দুটি বোধ কাজ করে— এক, পাতিব্রত্য, দুই, মাতৃধর্ম। এছাড়া, আধ্যাত্মিকতায় মহিমান্বিত নারী এক পৃথক জ্ঞানলাভও করে। পতিধর্ম অনুসরণ করতে গিয়ে যেখানে অধ্যাত্মধর্মের স্ফূরণ হয়, সেখানে মাতৃত্বের বিকাশও হয়। সেই প্রসঙ্গে অবশ্যই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণজায়া সারদামণির জীবনের উল্লেখ করতেই হয়। তিনি আধুনিক যুগের বরেণ্যা নারী। হয়ত অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন যে মা সারদা অজ পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র ঘরের কন্যা, কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই— কীভাবে তিনি বরেণ্যা? তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা বিহনেও নিজস্ব সত্তার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা সমগ্র নারী সমাজের কাছে অনুসরণীয় পথ এবং তা চিরকালীন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হয়ে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে পাতিব্রত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রথম থেকেই অধ্যাত্মভাব ও মাতৃভাবের উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বয়ঃক্রমে অধ্যাত্মভাবে শিক্ষালাভ হয় পতিগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াতলে। পরবর্তী জীবনে শিষ্য ও ভক্তদের অবলম্বন করে তাঁর মাতৃত্বের বিকাশ। তিনি তাঁর জীবন ও স্নেহবাৎসল্য দিয়ে নারী সমাজকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, গর্ভের সন্তান না হলেও একান্ত ভালবাসা, স্নেহ, করুণায় সকলকে সন্তানজ্ঞানে কাছে টানা যায় এবং সর্বজনের 'মা' হওয়া যায়। জননী সারদাকে সকল স্তরের নারীর মধ্যে মিশে তাদের নিজের ক'রে নিয়ে নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাগৃতিতে জীবনপাত করতে দেখা যায়। অন্তঃপুরবাসিনী মা সারদার মন ছিল উদার ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতা উদার মানসিকতায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে কাছে টেনে নিতেন তিনি। বিশেষত সে যুগে তথাকথিত 'অচ্ছুত' বিদেশিনী মার্গারেট নোবেল (উত্তরকালের ভগিনী নিবেদিতা) ও তাঁর তিন বন্ধুকে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্যে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। কত বড় আত্মত্যাগ, কত বড় উদার মন। নারী সমাজের কাছে যা শিক্ষণীয়। আজ যতই সমাজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলুক না কেন, নারী শিক্ষিত হলেও কু-সংস্কার, জাতিভেদ অনেকেরই মজ্জায় মজ্জায় রয়ে গেছে। সারদা তাদের অন্ধদৃষ্টি খুলে দেবার দিক্‌নির্দেশ করে গেছেন।

যে যুগে পুঁথিগত শিক্ষালাভ এককথায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল কার্যত 'অসম্ভব'; পাঠশালায় গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার উপায় ছিল না মেয়েদের। ছোট সারদা সংসারের সব কাজ সেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়তেন। এছাড়া, জননী শ্যামাসুন্দরীর কাছে ভারতীয় মহাকাব্যের কথা শুনতেন মন দিয়ে। শিক্ষায় আগ্রহী সারদা তাই মার্গারেটের তথা ভগিনী নিবেদিতা স্থাপিত বিদ্যালয়ের (বাগবাজারে) শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত হয়ে নারী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বলেন। সে সময়ের গোঁড়া সমাজের আগলবদ্ধ নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন শিক্ষালাভের জন্য। একইসঙ্গে বলেছিলেন— এই বিদ্যালয় থেকে যেসব মেয়ে পড়াশোনা করবে, তারা আদর্শ নারী হয়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীমাকে আমরা দেবীজ্ঞানে উচ্চ আসনে স্থান দিয়ে থাকি, কিন্তু তিনি ছিলেন সংসারের আর পাঁচজন গর্ভধারিণী মা-র মতোই শোকসন্তাপহারিণী মা। তিনি আদর্শ জননীরূপে গৃহী-মা-দের পথপ্রদর্শক। সংসারের সাধারণ নারীদের মতো কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর সুবিপুল মাতৃস্নেহ কখনও পরিতৃপ্ত ও আবদ্ধ থাকতে পারে না। জগতের সকলেই তাঁর একান্ত নিজের সন্তান। সেই যে ঠাকুরকে একবার নিজের সন্তানহীনতার জন্য খেদ প্রকাশ করায় ঠাকুর বলেছিলেন— এখন একটা মা ডাকের জন্য ব্যাকুল হচ্ছ, এরপর হাজার হাজার সন্তানের 'মা-মা' ডাকে অস্থির হয়ে উঠবে। তাই মা সারদার মধ্যে জগজ্জননী যেন জেগে উঠেছিলেন। তাই দিয়ে বিশ্ব মাতৃস্নেহের স্রোতে হাজার হাজার নরনারীকে পরিস্নাত করে দিয়েছিলেন। 'সন্তান'দের জন্য তাঁর ভাবনা, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। তাঁর এই উদার অপার অবাধ মাতৃস্নেহ তুলনাহীন। আজকের দিনে শিক্ষিত মায়েরা একটি বা দুটি সন্তানের প্রতি এতই স্নেহে বিগলিত এবং অন্ধস্নেহে আচ্ছাদিত যে সন্তানের ভুলভ্রান্তি, অন্যায়কে দেখতে পান না। অতিরিক্ত নজরে সন্তানদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিচ্ছেন তাঁরা। পুরুষদের তথাকথিত সমকক্ষ করে গড়ে তোলাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এখানেই আক্ষেপের বিষয় যে, আজকের মাতৃজাতি ভুলে যাচ্ছে তাদের চিরন্তন আদর্শ। ভুলে যাচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য যে বাইরের চাকচিক্য নয়; অন্তরের ঐশ্বর্যে স্বভাবের মাধুর্যে।

একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অধিকার দাবি করে পাওয়া যায় না; অর্জন করতে হয় যোগ্যতায়। শুধুমাত্র স্কুল কলেজের কেতাবি শিক্ষায় কিছু হয় না; নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে যাতে সে আদর্শ কন্যা, আদর্শ বধূ, আদর্শমাতা হয়ে উঠতে পারে। নিজের মধ্যে আপনার নারীত্বের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এটাই শ্রীশ্রীমার চিরকালের শিক্ষা। আজকের দিনে নারীর তখনই উন্নতি হবে, যখন তারা শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ অনুসরণ করবে।

পুজো সংখ্যা স্বস্তিকা

বৃত্তের বাইরে চলুক কিছুটা উৎকর্ষের লক্ষ্যেই

শমিতা সাহা

'স্বস্তিকা' স্ত্রীলিঙ্গ— অর্থাৎ নারী। নারীর ভূষণ হলো অলংকার। অলংকার আর সজ্জার জোরে নারী হয়ে ওঠে অপরূপা। তাই নারীর অঙ্গসজ্জা এতটাই জরুরি। 'স্বস্তিকা' যেহেতু একটা পত্রিকা এবং নামের সূত্রে নারী, সুতরাং তার আভরণ হলো তার আঙ্গিক, অলংকরণ এবং পাঠ্য রচনাবলী।

স্বস্তিকা-র পাঠকমাত্রই বাহান্নটি নিয়মিত সংখ্যার মধ্যে একমাত্র পুজো সংখ্যার জন্য মুখিয়ে থাকে। পুজো সংখ্যাটি তাই অনবদ্য হয়ে ওঠে গল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধের এক মিশেলে। প্রতি বছরের মতো এবারেও পুজো সংখ্যার বিষয়ে লিখতে বসে যে যে বিষয় পাঠক হিসেবে ঘাটতি লেগেছে শংসা-র মাধ্যমে অবশ্যই তা জানাতে হবে, পত্রিকাটিকে আরও বেশি উপজীব্য, সুখপাঠ্য করে তুলতে যাতে পাঠকবর্গের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়ে, তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে কী, পুজো সংখ্যা পুরো পড়ে ওঠা হয়ে ওঠেনি, তবুও সময়ের দাবী মেনে একটা কিছু লিখতে হয়, নইলে একটা সময়ের পর পুরো লেখাটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

সবার আগে সাধুবাদ জানাই 'স্বস্তিকা'-র কর্তৃপক্ষকে। আর পাঁচটা বাজারি পত্রিকার থেকে বাণিজ্যের কঠিন প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে 'স্বস্তিকা' বিগত ছয় দশক ধরে এটা কম কথা কী! তবুও বলব 'স্বস্তিকা' একটু বৃত্তের বাইরে হাঁটুক।

সেটা কী রকম! একসময়ে 'স্বস্তিকা' অনেক সাংবাদিক তৈরি করেছে। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি যাঁদের এই পত্রিকায় হয়েছে, তাঁরা আজ অনেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সুতরাং সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক 'স্বস্তিকা'। কিছু কিছু রচনা একঘেঁয়ে লেগেছে। যেমন রমানাথ রায়ের লেখা। রমানাথবাবু একজন নামকরা সাহিত্যিক। বেশ কয়েকবছর ধরে তাঁর অনেক ভাল ভাল লেখা বাংলার বড় বড় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বস্তিকা-র' পুজো সংখ্যার তিনি নিয়মিত লেখক। আগে বহু ভাল রচনা 'স্বস্তিকা'-র পাঠককুলকে মোহিত করেছে। কিন্তু দু-চার বছর তাঁর লেখা একঘেঁয়ে, আর এক গঁতে লেখা। যাঁর কলম এতদিন মানুষকে মুগ্ধ করে এসেছে, সেই কলম থেকে একটা ভাল লেখা কেন বেরুচ্ছে না। এটা রমানাথ-বাবুর কাছে জানতে ইচ্ছে করে। তাঁর কাছে পাঠক হিসেবে আবেদন আপনিও বৃত্তের বাইরে চলুন।

'স্বস্তিকা-র' প্রসিদ্ধি তার প্রবন্ধে। একটা বিশেষ ভাবধারার পত্রিকা। সেই হিসেবে বিজয় আঢ্য-র 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। আমাদের দেশে 'দীনদয়ালজী-র' মতো প্রচার-বিমুখ এক সংগঠক কীভাবে নিরলসভাবে দেশের সেবা করে গেছেন তারই আলেখ্য বিজয়বাবু সু-নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। রচনাটির মাধ্যমে দীনদয়ালজীর জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানা হয়ে গেল।

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত এবারের

উপন্যাস 'বৃত্তের বাইরে' রচনাটিতে অবশ্যই তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'স্বস্তিকা-র' পুজো সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকেই তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাস অবশ্যই পাঠকদের মুগ্ধ করেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। আর তারই অঙ্গ হিসেবে শিক্ষার রাজনীতিককরণের যে অপপ্রয়াস বেশ কয়েকবছর ধরে এরাজ্যে চলে আসছে তারই একটা দলিল 'বৃত্তের বাইরে' উপন্যাসটি। এ রাজ্যে ইদানিং শিক্ষায় 'অনিলায়ন' কথাটা চালু হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতিককরণের যে প্রয়াস প্রয়াত সিপিএম রাজ্যসম্পাদক অনিল বিশ্বাস করে গেছেন এবং এই প্রয়াসের ফলে অনেক দক্ষ শিক্ষক তাঁদের মর্যাদা পাননি বা যাঁরা দলের ছন্দে পা মেলাননি তাঁদের অনেকে হেনস্থা হয়েছেন বা প্রোমোশন পাননি। সেই দলেরই একজন আরশি নগর কলেজের অধ্যাপিকা ঈশানী দত্তরায়। কলেজ অধ্যক্ষের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়ায় পার্টি কীভাবে তাঁকে মানসিকভাবে নিগৃহীত করেছে এবং বাধ্য করেছে পদত্যাগ করতে তা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন সৌমিত্রবাবু।

'স্বস্তিকা'য় তথাগতবাবু নিয়মিত লেখক। 'কেন হিন্দুরা এরকম' প্রবন্ধে হিন্দুদের লেখার বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। আজকে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বিবৃতি আর অসত্য তথ্য পড়ানো হয়। খিলাফৎ আন্দোলন কি এ সম্পর্কে লেখা হলেও কোন কোন নেতার কী ভূমিকা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ ব্যাখ্যা করলে লেখাটা আরও বেশি সমৃদ্ধ হোত।

'স্বস্তিকার' উৎকর্ষ বৃদ্ধির গুরুদায়িত্ব যেসব লেখক-লেখিকার ওপর ন্যস্ত তার মধ্যে সুমিত্রা ঘোষ অন্যতমা। প্রতিবছর ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পাঠকবর্গকে উপহার দেন। ব্যতিক্রমী এই লেখিকার মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়। 'মানুষ' উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সায়ন আর পর্ণা এ যুগের ছেলে মেয়ে। সবযুগেরই ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে বিদ্রোহী হতে চায়। সায়ন আর পর্ণা স্বাভাবিক ভাবেই দুজন এমন মানব-মানবী। যুগধর্মের গড্ডলিকা প্রবাহে এরা প্রথাবিরোধী ভাবে সহবাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ছাত্রজীবনেই তাদের অভিভাবকদের না জানিয়েই। ঊনবিংশ শতকে এমনটা হলে ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু একবিংশ শতকে পশ্চিমি হাওয়ায় এটাই যেন দস্তুর। অভিভাবকদের মানসিক যন্ত্রণা দেওয়াটাই এদের ধর্ম-কর্ম। এদের আমরা কী বলব? ব্যভিচারী, না কি সমাজ-বিবর্তনের বিপ্লব-বিপ্লবী এরা— এই প্রশ্নটাই রেখেছেন সুমিত্রা ঘোষ।

আলোচনার শুরুতেই যে প্রস্তাব রেখেছি 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে, সেখানেই ফিরে গিয়ে বলছি— 'স্বস্তিকা' বৃত্তের বাইরে চলুক। দশ-বারো থেকে উনিশ-কুড়িবছর বয়সীদের উপভোগ্য কোনও রচনা-ই নেই এবারের সংখ্যায়। আশা করব আগামীদিনে এনিয়ে ভাববেন।

স্থানাভাবে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই প্রবন্ধটির ইতি টানব ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর লেখাটা দিয়ে। রাধেশ্যামবাবু একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও পদার্থবিদ। ইতিহাসেও যে বিজ্ঞানের মতো তাঁর সমান রুচি সে প্রমাণ মিলল এবারের ইতিহাস নির্ভর রচনা 'আজকের খৃস্টধর্ম যিশু প্রচারিত ধর্ম নয়' এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে যিশুর জন্মবৃত্তান্ত, যিশুর ভারতে আগমন আর খৃস্টধর্মের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব— এমনই সব বহু তথ্য রয়েছে। রাধেশ্যামবাবুর এই রচনাটি ইতিহাস বিষয়ে নিয়ে গবেষকদের এক প্রতিপাদ্য হতে পারে। আগামী বছরের পুজো সংখ্যা 'স্বস্তিকা' আরও বিভিন্ন স্বাদের লেখায় সমৃদ্ধ হোক এমনই দাবি রাখে পাঠককুল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন-যুদ্ধ

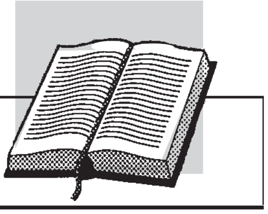

পুস্তক প্রসঙ্গ

ভিক্ষুদেব ভট্ট

৮৭ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর (জন্ম ১১ শ্রাবণ ১৩৩১) নিকট এখন মসীই তাঁর অসি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তকটির প্রসঙ্গে

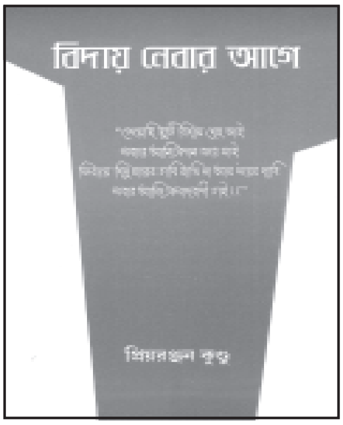

লেখকের জবাবদিহি : '১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ক্ষমতা-দখলের জন্য তদানীন্তন দেশের নেতৃবৃন্দ, তড়িঘড়ি দেশভাগের মধ্য দিয়ে যে দেশদ্রোহিতার কাজ করেছিলেন তার নেপথ্য কাহিনী যে মানুষটি দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে অনলসভাবে উন্মোচিত করে যাচ্ছে তারই বংশধর তারা।' (পৃ-১১) পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার দেওভোগ গ্রামের সন্তান ছেলেবেলা থেকেই শুরু করেছেন জীবন-সংগ্রাম। ময়মনসিংহে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই দুই দেশপ্রেমিক-ব্যায়ামাচার্য ধীরেন্দ্রমোহন সেন এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী মেজর জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদারের নিকট হতে পেলেন ব্রহ্মচর্য ও মাতৃমন্ত্রের দীক্ষা। যুক্ত হলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে। এই পার্টি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য, যুদ্ধোত্তরকালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) নবগঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের আদর্শ এক নয়। নীতিগতভাবে তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে।' (প-২৩) (সুভাষ) 'সম্যক উপলব্ধি করলেন, যতদিন গান্ধীজী কংগ্রেসের সর্বেসর্বা থাকবেন ততদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। কারণ, রাজশক্তির অঙ্গুলি হেলনে তিনি তার গোড়া কেটে দেবেন এবং 'দেশ প্রস্তুত নয়', 'শত্রুর বিপদের দিনে (তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল) তাকে বিধ্বস্ত করা অনৈতিক কাজ' কিংবা 'মুসলীম লীগ পথ অবরোধ করে রেখেছে' এরূপ নানাপ্রকার বাহানা তুলে সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করবেন।' (প-২৭)

আলোচ্য পুস্তকের লেখক প্রিয়রঞ্জনবাবু শুধু নিজের জীবন কথা নয়, পূর্ববাংলার কথা, জেলে প্রায় তিন বছর থাকার কথা, কলকাতার কথা প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে। তাতে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক বিপ্লবীর মণি-মুক্তো-কথা। ১৬৮ পৃষ্ঠার বইয়ের মধ্যেই লেখকের আর একটি বই 'রাজবন্দীর চিঠি' স্থান পেয়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবি নিয়ে। রয়েছে ৩২টি চিঠি।

রাজবন্দীদের চিঠি ছাড়া প্রিয়রঞ্জনবাবু ৪টি সংকলন পুস্তক এবং প্রায় ৩০টি ছোট-বড় পুস্তক লিখেছেন। এগুলির মধ্যে ১৭টি পুস্তকের সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গুণীজনের মতামতও আলোচ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। ফলে লেখক বহু বিচিত্র অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর ভাষায়— 'দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে সরকারি, বেসরকারি এবং নিজের চেষ্টায় যেই মাত্র বাস্তহারারা একটু শক্ত মাটির উপর পা রাখতে পেরেছেন অমনি তাঁরা ভুলে গেলেন মা-বোনেদের বেইজ্জতের মর্মান্তিক কাহিনী, বেমালুম হজম করে ফেললেন বাবা, কাকা, প্রতিবেশীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, এরই মধ্যে বিস্মৃত হলেন তাঁদের স্ব স্ব পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রামের হৃদয়বিদারক চলমান ছবির দৃশ্যের কথা।' (প-১৪৭)

লেখক বলছেন, 'পুস্তকগুলি নিয়ে যখন পরিচিত মহলে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন যেসব অমৃতবাণী শুনতে হয়েছে... কেন আবার এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন?...গান্ধীকে পৃথিবী মান্য করে...যা হবার হয়ে গেছে...ছেলে তো ভালই রোজগার করছে... যেটুকু সময় পাই ধর্মগ্রন্থই পড়ি...মুসলমানদের নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না... এরূপ অনেক উপদেশামৃত বর্ষিত হয়েছে আমার উপর।... তা বলে আমি থেমে থাকিনি কিংবা হতোদ্যমও হইনি।' এই আজীবন যোদ্ধার বই পড়ার জন্য বহু লোক এখনও আছে। আমরা আশা করি লেখক আরও বেশি করে মসী ধরুন, ঈশ্বর তাঁকে সেই ক্ষমতা দিন। 'বিদায় নেবার আগে'-র শেষ পৃষ্ঠায় লেখকের আশা— 'প্রয়োজন একটি লৌহকঠিন সংগঠন। সে সংগঠন যতদিন না গড়ে উঠছে ততদিন কি তবে সাধারণ মানুষকে ভুগতেই হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সেই সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং তা অনতিবিলম্বেই। কীভাবে তাঁরা এগোবেন সেপথও তাঁদেরই বেছে নিতে হবে।'

আশা করা যায়, দেশ ও সমাজ সচেতনদের নিকট পুস্তকটি আদৃত হবে।

বিদায় নেবার আগে
লেখক ও
প্রকাশক—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
পি-৪৭, এল আই সি
টাউনশিপ
মধ্যমগ্রাম,
কলকাতা-৭০০১৯২;
মূল্য—১০০ টাকা

ভালো বই শুধু আনন্দ দেয় না, চেতনাও জাগায়

কল্যাণভঞ্জ চৌধুরী

'বিবিধ প্রবন্ধ' লেখকের একাধিক প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো : Democratic Socialism, The manifesto of a democrati, ভারতের সংবিধান কার স্বার্থে রচিত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলে হিন্দুস্থান অবশ্যই হিন্দুরাষ্ট্র; হিন্দুই হিন্দুর পুনরুত্থানের পথ। লেখক প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে কমুনিজম-এর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। উন্মোচন করেছেন সেকুলারিস্টদের ভণ্ডামি, নির্লজ্জ মুসলমান-প্রীতি।

কুরান শরীফ কী ও কেন? গ্রন্থে লেখক অতি বলিষ্ঠ ভাষায় দেখিয়েছেন ইসলাম-ভ্রাতৃত্ব অস্ত্রের দ্বারা, ইসলামের বিস্তার। গোটা বিশ্ব অমুসলমান শূন্য করা। লেখক গ্রন্থটিতে ইসলামের উৎপত্তি, আচরণ বিধি লক্ষ্য ইত্যাদি উদ্ধৃতি সহযোগে এত সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে একবার নয় বারে বারে পড়তে ইচ্ছা করে, অবিরত প্রশ্ন জাগে মানবিক, পৈশাচিক এই ধর্ম কি ইসলাম?

আমরা শ্রী কুণ্ডুর গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। তাঁর গ্রন্থগুলি পড়ে পাঠকেরা যেন হিন্দুত্বের ধ্বজা আরও উর্দ্ধে তুলে ধরেন। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শুধু আনন্দ দেয় না, জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু। বিবিধ প্রবন্ধ। মূল্য ২৫০ টাকা।
প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু। কুরাণ শরীফ কী ও কেন? মূল্য ১০০ টাকা।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর বর্ষব্যাপী জন্মশতাব্দীর সূচনা

অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, সত্যনারায়ণ মজুমদার ও বিজয় কুলকার্নি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তাঁরই শুভ জন্মদিনে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর বর্ষব্যাপী জন্মশতাব্দী অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় গত ১ ডিসেম্বর।

সভার সূচনায় শতবর্ষ উদ্যাপন সমিতির সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ওই দিনকার অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রবীণ সন্ন্যাসী রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, বিদ্যাভারতী'র সর্বভারতীয় কার্যকর্তা বিজয়গণেশ কুলকার্নি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার ভারতমাতা এবং স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, সবার কাছে 'মাস্টারমশায়' নামে সুপরিচিত হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস্ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক। দীর্ঘ দশবছর যাবৎ তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করে ১৯৭৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণের পর বিশেষ অতিথি বিজয়গণেশ কুলকার্নি মাস্টারমশায় যুবকদের কীভাবে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেকথা তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেন। মাস্টারমশায়ের আদর্শ অনুসরণ করে দেশ-সমাজের কাজে সকলের সদাসক্রিয় থাকাই তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন বলে প্রধান অতিথি সত্যনারায়ণ মজুমদার তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মাস্টারমশায়কে তাঁর শিক্ষক, প্রতিবেশী এবং হিন্দু সংগঠন কাজে সহযোগী হিসেবে দেখেছেন। মাস্টারমশায়ের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন। দেবানন্দজী বলেন, বর্তমানে শিক্ষার চরম অবক্ষয়ের যুগে তিনি ছিলেন আদর্শ ছাত্রদরদী শিক্ষক। আর্থিক চাহিদা নয়, শিক্ষাদানই ছিল প্রথম ও শেষ কথা। শেষে ধন্যবাদ জানান শতবর্ষ উদ্যাপন সমিতির পক্ষে স্বপন নাগ। তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে মাস্টার-মশায়ের লেখা গান অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বন্দেমাতরম্ দিয়ে সভা শেষ হয়। হল ভর্তি শ্রোতাদের মধ্যে মাস্টারমশায়ের সুযোগ্য সন্তানদ্বয় পুত্র অরুণ চক্রবর্তী ও কন্যা ঋতা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বর্গীয় অমিয় মজুমদার স্মারক বক্তৃতা

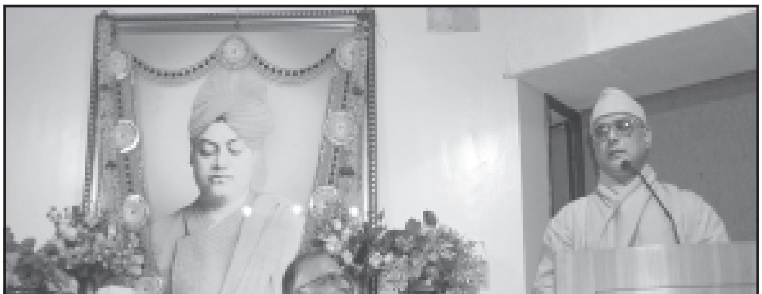

ভাষণরত স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। বসে (বাঁ দিক থেকে) স্বামী শিবময়ানন্দ ও কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "কোটি কোটি মানুষের হাজার হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের ঘনীভূত বিগ্রহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে সবকিছু দিয়ে ফকির হয়ে যাওয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সূক্ষ্মরূপেরই বাহ্যিক স্থূল স্বরূপ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যই হলো, আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা। স্বামীজী তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আজকের ভারত তথা বিশ্বের চেহারাটা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই দুরবস্থার নিদান হলো ভারতের আধ্যাত্মিকতা, বৈদান্তিক দর্শন। যা বিশ্ব সভ্যতায় ভারতবর্ষের অবদান, যা স্বামীজী পাশ্চাত্যকে দু'হাত ভরে দিয়ে গিয়েছেন।" উপরের কথাগুলি বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত স্বর্গীয় অমিয়কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' শীর্ষক আলোচনায় বলেন বেলুড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ। গত ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িস্থিত সভাগারে পাঠচক্রের উদ্যোগে এই বক্তৃতাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সভায় স্বাগত ভাষণ দেন কর্ণেল (অবসরপ্রাপ্ত) সব্যসাচী বাগচী। সভাপতিত্ব করেন স্বামীজীর জন্মস্থান-স্থিত কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী কি তিস্তার পানিতে ডুবে ম'ল?

শিবাজী গুপ্ত

বলতে গেলে পুরোনো কথাই নতুন করে বলতে হয়; বিশেষত ভারত- বাংলাদেশ সম্পর্কে। তা আজকের কাছে চর্বিত-চর্বণ ঠেকতে পারে; কিন্তু চর্বণ করার মতো নতুন বিষয় যখন আপাতত আর নেই, তখন রসহীন চর্বিত বস্তুকেই বারেবারে চিবোতে হয় বই কি! ভারত-পাকিস্তান, ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে যদি স্থায়ী শান্তিই স্থাপিত হবে, তাহলে রাম-রাবণে বা কুরু-পাণ্ডবেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যুগ পরিবর্তনেও হুজুগ হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে না।

সৃষ্টিকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নেতারা ভারত ভ্রমণে এলে কিছু না নিয়ে দেশে ফেরে না— কখনও জল, কখনও মাটি, কখনও যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধা, কখনও বা দরাজ হাতে ব্যবসা-বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। অথচ বিনিময়ে ভারতের ভাগ্যে জোটে লবডঙ্কা, উপরন্তু ফাঁক পেলেই পশ্চাদ্দেশে আছোলা বাঁশ দিতে দ্বিধা করে না। সাম্প্রতিক তিস্তা জলচুক্তি নিয়ে যে গেঞ্জাম সৃষ্টি হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে একটু পেছন ফিরে দেখা যেতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে তিন বিঘা চুক্তির দিনগুলির কথা।

১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে একজোট হয়েছিল কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট দল। পরিণামে বাঙালী হিন্দুর সর্বনাশের পথ সুগম করেছেন তাঁরা। ৪৫ বছর পর আবার তিন বিঘা নামক ভূ-খণ্ড পাকিস্তানের নামান্তরে বাংলাদেশকে খয়রাত দিতে একজোট হয়েছে এই দুই দল। সে সঙ্গে জুটেছে উচ্ছিষ্ট-ভোজী ফরোয়ার্ড ব্লক। তার ফলে আরও ৫০, ০০০ হাজার ভারতীয় নাগরিকের ভবিষ্যৎ বরবাদ করার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। লোকে কথায় কথায় যে বলে— 'কংগ্রেস কম্যুনিস্ট দুই পাপ : বাঙালি হিন্দুর অভিশাপ'— তা একেবারে অযথার্থ নয়।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর মঙ্গলচিন্তায় ক্রম স্ফীতমান মুখ্যমন্ত্রী অভয় দান করেছেন যে তিন বিঘা লিজ দেওয়া হলেও তার উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। এ তো তালাক দেওয়া বিবির উপর খসমত্ব ফলাবার মতোই হাস্যকর। শুনলে যে ঘোড়ায় হাসবে! যে বাংলাদেশ তার জন্মদাতাকে অস্বীকার করে চূড়ান্ত নিমক-হারামি ও কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছে, তাকে তিনবিঘা উপঢৌকন দিলেই না কি তার সঙ্গে ভাই-বেরাদর সম্পর্কে সিমেন্ট- কংক্রিটের মতো সুদৃঢ় হবে এবং তার ফলে :

(১) পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথ পুনরায় চালু হবে,

(২) বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে জলপথে অসমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে,

এখন শুরু হয়েছে তিস্তা পানি পর্ব। যে বাংলাদেশে ভারত থেকে ৫০টির অধিক নদী দিয়ে অনবরত জল ঢুকছে, তাতেও তাদের পানির পিপাসা মিটছে না, তিস্তার পানির জন্য 'হায়পানি হায়পানি', করতে করতে তাদের হাঁপানি রোগে ধরেছে যেন।

(৩) কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত (আগরতলা) সরাসরি বাস চলবে,

(৪) কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ও আখাউড়া হয়ে ত্রিপুরায় মাল পাঠানো যাবে,

(৫) বাংলাদেশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাবে।

এই সবই ধোঁকাবাজ মুখ্যমন্ত্রী (জ্যোতি বসু) ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের প্রচার। কিন্তু বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ থেকে এ সম্পর্কে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি। যাঁরা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই গোলাপী চিত্র তুলে ধরছেন, তাঁরা দয়া করে বলবেন কি—

(১) বাংলাদেশে 'আল্‌ফা'-দের আশ্রয় ও শিক্ষাদান কোন্ বন্ধুত্বের পরিচয়?

(২) লাখখানেক চাকমাকে ভারতে ঠেলে পাঠান কি ধরনের সুপ্রতিবেশী সুলভ চিন্তাধারা?

(৩) পাকিস্তানের সেনা-প্রধান বাংলাদেশের সামরিক ঘাঁটি ও সীমান্ত চৌকি পরিদর্শন করেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যে?

(৪) পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারি করা 'শত্রু সম্পত্তি' আইন আজও বলবৎ রেখে বাংলাদেশের অবশিষ্ট হিন্দুদের জীবন বিষময় করে তোলা হচ্ছে কেন?

(৫) শতাধিক ছিটমহল বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই সমস্যা চিরতরে মিটিয়ে না ফেলে, ক্ষুদ্র একটি ছিটমহলে মিলিটারি ও সামরিক সরঞ্জামাদি নিয়ে অবাধে যাতায়াত করার অধিকার বাংলাদেশকে দান করে স্বদেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার কি যৌক্তিকতা আছে?

অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে তুললাম না। কিন্তু মোল্লাতন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে যারা মাখোমাখো সম্পর্ক স্থাপনে অধীর তারা দয়া করে উপরোক্ত জিজ্ঞাসার জবাব দিলে পশ্চিমবঙ্গবাসীগণ একটু আশ্বস্ত হতে পারে। কারণ আমাদেরই মতো ৫০,০০০ ভারতীয় নাগরিকের জীবনজীবিকা, মানসম্ভ্রম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে তিনবিঘা লিজ দেবার ফলে। নিজেদের খাস জমি ও নাগরিকদের বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়া কোন্ ধরনের কূটনৈতিক বোঝাপড়া?

এই নির্বুদ্ধিতারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকারের বোঝাপড়ার প্রতিটি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। পশ্চিমে তাঁরা ভেবেছিলেন সিন্ধুনদীর জলের ৮০ ভাগ পাকিস্তানকে দিলে তারা কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে নমনীয় হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সে আশায় থর মরুভূমির বালি। পূর্ব পাঞ্জাব সিন্ধু জল থেকে বঞ্চিত হলো, আর পাকিস্তানি পাঞ্জাব সুজলাং সুফলাং হলো।

দেশের পূর্বাংশে কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে ফরাক্কা ব্যারেজ হলো। বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গাজল বন্টন চুক্তিতে বাংলাদেশ আশাতিরিক্ত পানি পেয়ে তাদের নেতারা নাচতে নাচতে ঢাকায় ফিরে গেল। আমাদের কলকাতা পোর্ট শুকিয়ে মরল, হলদিয়া পোর্ট শুকোচ্ছে। আর বাংলাদেশ খুড়োর কলের মতো আমাদের পদ্মার ইলিশ দেখাচ্ছে!

এখন শুরু হয়েছে তিস্তা পানি পর্ব। যে বাংলাদেশে ভারত থেকে ৫০টির অধিক নদী দিয়ে অনবরত জল ঢুকছে, তাতেও তাদের পানির পিপাসা মিটছে না, তিস্তার পানির জন্য 'হায়পানি হায়পানি', করতে করতে তাদের হাঁপানি রোগে ধরেছে যেন। তাদের পানি-ব্যাধি সারাতে আমাদের বকলমা প্রধানমন্ত্রী ৫০ ভাগের বেশি তিস্তার পানি দান করতে ঢাকায় ছুটেছিলেন। ভাগ্যিস মমতা ব্যানার্জী টের পেয়ে গেলেন, তাই রক্ষা; না হলে উত্তরবঙ্গও উষর মরুভূমিতে পরিণত হোত।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবনা থাকা ভালো; কিন্তু তাই বলে ঘরের দরজা খোলা রেখে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোও বুদ্ধিমানের কাজ তো নয়ই। বরং আত্মহত্যার সামিল।

ফেডেরার বিশ্বসেরা, লি-হেশ ছন্নছাড়া

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রজার ফেডেরার লন্ডনে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব্ টেনিসে খেতাব জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আর আমাদের সবার প্রিয় জুটি লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি ওই একই আসরের সেমিফাইনালে ছিটকে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করে লিয়েন্ডার জানিয়ে দিলেন, অনেক হয়েছে আর নয়। এবার তাঁদের দুজনেরই সময় এসেছে নতুন জুড়িদার খুঁজে নেওয়ার। তাতে অলিম্পিক পদক চুলোয় যাক। আসলে দুজনেই বুঝে গেছেন এই বয়সে এসে আর টেনিস বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। এ বছর তাঁরা তিনটি এটিপি খেতাব জিতলেও একমাত্র গ্রান্ডস্লাম ফাইনালে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে বিশ্বসেরা জুটি মাইক ও বব ব্রায়ানকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেও সেমিফাইনালে অনামী পোলিশ জুটির কাছে বধ হয়েছেন তাঁরা।

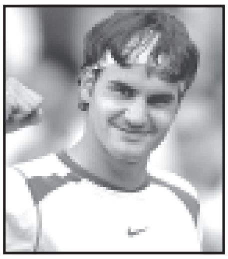

ফেডেরার

লিয়েণ্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি

ওদিকে ফেডেরার এবছর কোনও গ্রান্ডস্লাম ফাইনালে ওঠেননি। ২০০৩-এর পর এই প্রথমবার কিন্তু মোক্ষম টুর্নামেন্টটি জিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মধ্যে এখনও যথেষ্ট টেনিস স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট আছে। এই বছর বয়স-কে সার্কিটে যথেষ্টই বলা চলে। কিন্তু সার্ভিসে পাওয়ার কমে গেলেও 'অ্যাথলেটিক ফিটনেস' ও 'জিমনাস্টিক এবিলিটি' কিন্তু অটুট রয়েছে তাঁর। আর টেকনিক্যাল স্কিলে এখনও নাদাল, ডকোভিচ, মারে, ফেরারদের থেকে এগিয়ে আছেন। ইন্ডোর সারফেসে সেই স্কিল ও অলকোট ক্রাফটের ঔজ্জ্বল্য মেলে ধরে 'সুপারম্যান' জো উইলফ্রেড সঙ্গাকে ফাইনালে কখনও মাথা তুলতে দেননি। তাঁর আগের ম্যাচে স্পেনের অসাধারণ অ্যাথলিট-টেনিসতারকা ডেভিড ফেরারকে তাঁর পাশুপত অস্ত্রেই বধ করেছেন। মোট ৬ বার এই টুর্নামেন্টটি জিতে ইভান লেন্ড্রস ও পিট সাম্প্রাসের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ফেডেরার।

আর এই টুর্নামেন্টটি অধরাই থেকে গেল লি-হেশের কাছে। ১৯৯৭, '৯৮ ও ২০০১-এ তিনবার ফাইনালে উঠেও খেতাব হাতে নিতে পারেননি তাঁরা। তখন ছিল এই জুটির স্বর্ণযুগ। যা ধরছেন তাই সোনা হয়ে যাচ্ছে। তিনটি গ্রান্ডস্লামসহ অসংখ্য এটিপি খেতাব তাঁদের ড্রয়িংরুমে শোভা পাচ্ছে। কিন্তু লন্ডন তাঁদের উইম্বলডন দিলেও ওয়ার্ল্ড মাস্টার বা বিশ্ব চাম্পিয়নশিপ খেতাব তুলে ধরতে দেয়নি। এবছর যখন এঁরা নতুন করে জুটি বাঁধলেন, তখন ভূ-ভারতের সমস্ত টেনিসপ্রেমী আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। এই সরকারি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক সোনা, যা তাঁদের দীর্ঘলালিত অধরা স্বপ্ন তা বোধহয় সাতরঙা রামধনু হয়ে ফুটে উঠবে ভারতীয় টেনিসের দিগ্‌বলয়ে। তার পরিবর্তে কি দেখলাম— বিশ্বখেতাব হাতছাড়া হলো আর পরের দিনই চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। দুজনের যা বয়স ও মানসিক অবস্থান তাতে আর বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে বারেবারে লোক হাসিয়ে কি লাভ লি-হেশের? এ নিয়ে কতবার জুটি গড়লেন ও খেয়ালখুশি মতো ভেঙে দিলেন তাঁরা? নিজেদের কথা না ভাবুন, দেশের কোটি কোটি ভক্তের বুকে শেল বিঁধিয়ে দেওয়ার কি অধিকার আছে তাঁদের? পেশাদার সার্কিট, দেশ-কাল-সমাজ সবকিছু কি ছেলেখেলার বস্তু! একি পাড়ার খেলা যে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী সবকিছু চালিত হবে। কেন অল ইন্ডিয়া টেনিস ফেডারেশন ও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের ডেকে কড়কানি দেবে না? ব্যক্তি স্বার্থই কি দেশের স্বার্থ? নাকি অলিম্পিক সোনার থেকেও বড় ব্যাপার? শোনা যাচ্ছে এবার সেরকম কোনও মনোমালিন্য হয়নি দুজনের মধ্যে। শুধুমাত্র পার্টনার পাল্টিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য লিয়েন্ডার মহেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যেমন করেছেন রোহন বোপান্না তাঁর পাক সতীর্থ আইসাম কুরেশির সাপেক্ষে।

ফেডেরারকে দেখে শিখুক লি-হেশ। খেলা যে জীবনকে শেখায়, জাতি ও সমাজকে একসূত্রে গেঁথে দেয় তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হলেন রজার ফেডেরার। লি-হেশ এতদিন দেশবাসীর নয়নের মণি ছিল। যদিও তুচ্ছ কায়েমী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এর আগে দু'বার জুটি ভেঙেছেন তাঁরা। তখন কিন্তু দেশবাসী সব মেনে নিয়েছিলেন। আটমাস পরে অলিম্পিক। যে সোনার জন্য তাঁদের এতদিনের সাধ্য-সাধনা, দেশবাসীর হা-পিত্যেশ, তাকে সমূলে মাটিতে আছড়ে ফেললেন লিয়েন্ডার। পরে অবশ্য লিয়েন্ডার বলেছেন যে তাঁরা অলিম্পিকে জুটি বেঁধে খেলবেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পদক কেন, প্রথম রাউন্ড জেতার সম্ভাবনাই যে বিলীন হয়ে গেল!

শোক সংবাদ

গত ২৯ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক গৌরাঙ্গপ্রসাদ দাস ৭৮ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত এবং হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বিজেপি'র প্রাক্তন কাউন্সিলার, তাঁর নেতৃত্বে ৪টি সংস্কৃত শিবির হয়েছে। ২৭ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-নাতি-নাতনি বর্তমান।

শব্দরূপ-৬০৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

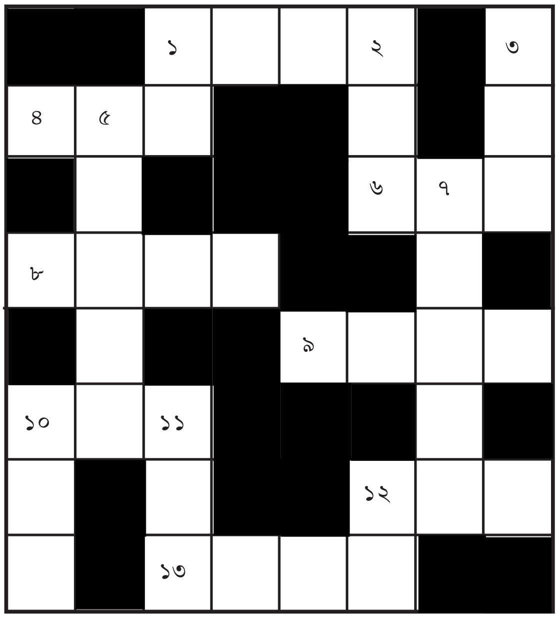

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মহালয়া থেকে কালীপুজোর আগের দিন পর্যন্ত যখন দেবী দুর্গার আরাধনা হয়, **৪.** গোবর, **৬.** সংগীতের তালবিশেষ, **৮.** বলদ, **৯.** রাজা রাজবল্লভের কীর্তি— ধ্বংসকারিণী পদ্মানদী, **১০.** সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান, **১২.** বৃক, **১৩.** ‘‘যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন __ ’’।

উপর-নীচ : ১. দানের যোগ্য, **২.** রাত্রি, **৩.** বিরাট রাজকন্যা, অভিমন্যু পত্নী, **৫.** বেদান্তবিরোধী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কে পরাজিত, **৭.** সেনাপতি, দণ্ডবিধানকর্তা, **১০.** সূর্য, অদিতি- কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র, **১১.** বাঁশি, **১২.** মনসামঙ্গলে মনসার সহকারিণী।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০৩
সঠিক উত্তরদাতা
অশোক দাস
বরাহনগর,
কলকাতা-৩৫
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা—৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৬০৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ ডিসেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা ।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ ।। ৩

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)